# ব্যাবিলন কথকতা

১১তম সংখ্যা

১৫ ডিসেম্বর ২০১৬

ব্যাবিলন গ্রুপ

TRENDZ™
WINTER COLLECTION 2016
www.trendzbd.com
/TrendzBangladesh

ডিসেম্বর ১৫, ২০১৬

সম্পাদক
এস এম এমদাদুল ইসলাম

# BABYLON

সহ-সম্পাদক
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি

বিশেষ সহযোগিতা
আরিফ হোসেন

প্রচ্ছদ
ফারহানা রহমান সুরভী

অলংকরণ
মৌসুমী মিতু
তাহরীমা তানজিন
সালাহউদ্দীন কাদের রাসেল

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
মৌসুমী মিতু

সহযোগিতা
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৯৩৬-১৫৬১০০

# সূচিপত্র

| | | |
|---|---|---|
| শুভেচ্ছা বাণী | | ৪ |
| সম্পাদকীয় | | ৬ |
| কথকতা-র হবু লেখক-লেখিকাদের জন্য | এস এম এমদাদুল ইসলাম | ১০ |
| একটি আইডি কার্ড এবং মানবতা | প্রদীপ কুমার দত্ত | ২০ |
| বিশুদ্ধ ভালোবাসা | মাহমুদুল করিম মজুমদার | ২৫ |
| চায়না ভাষা শেখার ইতিবৃত্ত | মুহাম্মদ সাইফুল হক | ২৭ |
| পারমিতা! | ইথার আক্তারুজ্জামান | ৩০ |
| টাকা | মোঃ জাকারিয়া হোসেন | ৩১ |
| সুঁচ-সুতা | মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম (রিসাদ) | ৩২ |
| শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে? | রতন চন্দ্র রায় | ৩৩ |
| বালকবেলা | মৌমিতা | ৩৪ |
| অদৃষ্ট | মৌসুমী | ৩৫ |
| শুনছো, আমরা সেদিন সদলবলে সভা করেছিলাম... | আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ | ৩৮ |
| অবিশ্বাসের পাথরে খোদাই যেন সে চোখ | মাহমুদ আলম সিদ্দিকি | ৪১ |
| জাহাজীর কথকতা | মোহাম্মদ জাবেদ মাহমুদ সবুজ | ৪৬ |
| স্বপ্নলোকের গল্পগাঁথা | কাজী এ এম তুষার আলম | ৫০ |
| আমিই আমার | মোঃ সাহিদুজ্জামান (শুভ) | ৫৬ |
| শহীদ মেজর নাজমুল হক | ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক | ৫৭ |
| কল্পনায় তুমি | মোঃ ফরহাদ হোসেন নির্জন | ৫৮ |
| মৃদু ছোঁয়া | আন্না হাসান | ৬০ |
| মা | আম্বিয়া | ৬১ |
| সুপ্ত ব্যথা | আব্দুর রউফ | ৬২ |

| | | |
|---|---|---|
| হারানো সেই দিন | হাবিবুর রহমান হাবিব | ৬২ |
| আতঙ্কের দিনগুলো | উম্মে সালমা ডালিয়া | ৬৩ |
| মুক্তি | এ কে এম গোলাম মহহী চৌধুরী | ৬৬ |
| সুখে থাক ভালোবাসা | মোঃ তানভীর হক সরকার | ৭২ |
| গন্তব্য | মোঃ জোবায়দুল ইসলাম | ৭৭ |
| অতঃপর | আতিকুল ইসলাম অপু | ৮৩ |
| আপনার দিনটি শুভ হোক... | আরিফ হোসেন | ৮৬ |
| মম নিসর্গশোভা | মোঃ গোলাম মাওলা | ৯২ |
| তোমার অপেক্ষায় না ফেরার দেশে | জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা | ৯৩ |
| প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং একজন ওয়েলফেয়ার কর্মী | আয়েশা সিদ্দিকা আরজু | ৯৪ |
| ডায়াবেটিস– একটি মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির নাম | ডাঃ আসমা আক্তার | ১০১ |
| মোল্লা ফারুক এবং ভূতের গল্প | হাসান মোঃ আশরাফুল হক | ১০৫ |
| Evolution of Social Compliance in Apparel Industry | Mohammad Hasan | ১০৮ |
| Photo Album | | ১১৭-১২০ |

# শুভেচ্ছা বাণী

বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই তাদের ব্যবসা পরিচালনায় মুনাফা অর্জনকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়– বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে এরকম একটা গতানুগতিক ধারণা ছিল আমার। ব্যাবিলন গ্রুপের একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সুবাদে আমার এ ভাবনাটি পুরোপুরি পাল্টে যায়। আমাকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল গ্রুপের একটি নিয়মিত বার্ষিক ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচনের জন্য– তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, অনেক প্রতিষ্ঠানই এ ধরনের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে তাদের গুণকীর্তন করার জন্য কিংবা প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য।

কিন্তু পত্রিকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরে আমার এই ধারণাটি পাল্টে গিয়েছিল। এই পত্রিকার যারা লেখক তারা এই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করেন– কেউ শ্রমিক, কেউ কর্মচারী, কেউ কর্মকর্তা– তারা গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, স্মৃতিকথা লিখেছেন। তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায় যাতে আবেগ রয়েছে, যুক্তি আছে, ভালোবাসা আছে এমন কি নির্মল উচ্ছ্বাসও আছে। জানতে পারলাম এর আগেও নিয়মিত নয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটির। আমি এসেছি দশম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনের জন্য!!

শ্রমিক কর্মচারীগণের জীবনমান নিশ্চিত করাই শুধু নয় তাদের মননশীলতার বিকাশের লক্ষ্যে গত নয় বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছেন পত্রিকাটির সম্পাদক এবং একই সাথে অত্র গ্রুপের পরিচালক এমদাদুল ইসলাম। তার সাথে কথা বলে শিল্প মালিকদের সম্পর্কে ধারণা পাল্টে গেল আমার।

প্রচলিতভাবে তৈরী পোশাক শিল্প সম্পর্কিত নানারকম গুণকীর্তন করা হলেও এর সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবনারও অভাব নেই আমাদের সমাজে। অতিরিক্ত শ্রম, কম পারিশ্রমিক, নানারকম হয়রানী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ইত্যাদি ইত্যাদি অভিযোগগুলো শোনা যায় প্রায়ই।

শ্রমিক কর্মচারীদের মেধাবিকাশের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, দেশের সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বৃত্তি প্রদান, শ্রমিকদের আর্থিক জীবনমানের টেকসই উন্নয়নের জন্য গবাদি পশু বিতরণ, উত্তরার একটি অরফান হাউজের অসহায় এবং প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, নিজস্ব মেডিক্যাল ক্লিনিকের মাধ্যমে শ্রমিক এবং কম্যুনিটির মানুষদের চিকিৎসা সেবা, ফ্রি হেলথ্ ক্যাম্প, আই ক্যাম্প, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা ব্যাবিলনের নিয়মিত সিএসআর কার্যক্রমের অংশ। নারী শ্রমিক এবং কম্যুনিটির নারীদের স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে ব্যাবিলন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নামমাত্র মূল্যে নিজস্ব উৎপাদিত স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করছে। এ এক অনন্য ইতিবাচক ভাবনা। অবাক হয়েছি ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের কথা শুনে এবং সদস্যদের ফটোগ্রাফি দেখে, এর চেয়ে দৃশ্যমান সৃষ্টিশীলতার সুযোগ আর কীভাবে দেয়া যেতে পারে!

ব্যাবিলন কথকতার প্রকাশনা উৎসবও আমাকে মুগ্ধ করেছে। শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের চোখে মুখে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস অথচ কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। মনে হলো সবকিছু পূর্বনির্ধারিত এবং স্বতঃপ্রণোদিত। এরকম সাবলীল সুন্দর অনুষ্ঠান এ দেশে সহজে চোখে পড়ে না। যারা শুধুমাত্র মুনাফার কথা না ভেবে তাদের কর্মীদের এবং একইসাথে বৃহত্তর সমাজের মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং সৃজনশীলতা বিকাশে এতকিছু করে যাচ্ছে– সেই ব্যাবিলনের প্রতি আমার প্রত্যাশার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। আমি আশা করি ব্যাবিলন এই প্রচেষ্টাগুলো যেমন অব্যাহত রাখবে তেমনি নতুন নতুন প্রয়াস নিয়ে তাদের কর্মচারী এবং দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে। কামনা করি অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং স্বাবলম্বী মানুষ কিংবা সংগঠন ব্যাবিলনকে অনুসরণ করবে।

শুভ হোক সকল প্রয়াস– ব্যাবিলনের পথ চলা দীর্ঘস্থায়ী হোক।

রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

# সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের তৈরী-পোশাক শিল্পটিকে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে এটা যেন এর নিয়তি। তা নয়তো যখন শিল্পটি রানা প্লাজা ধ্বংসোত্তর পরিস্থিতি, পরবর্তীতে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা– যা শিল্পটির উপর প্রায় দীর্ঘস্থায়ী অশুভ প্রভাব ফেলেছিল– প্রচুর উদ্যোগ ও অর্থ বিনিয়োগের বিনিময়ে যখন সেসবকে পিছনে ফেলে ওগুলোর কুপ্রভাব থেকে সফলতার সাথে বেরিয়ে আসছিলাম আমরা ঠিক তখনই ঘটল আবার আরেক সর্বনাশী ঘটনা। হ্যাঁ, গত জুলাইয়ের হোলি আর্টিজান বেকারির নৃশংস ঘটনাটির কথাই বলছি। সে এমন এক ঘটনা যে তা মুহূর্তে গোটা জাতিকে স্তম্ভিত করে দিলো।

এই দেশের জনগণের শান্তিপ্রিয়তা সুবিদিত। যখন মধ্যপ্রাচ্যসহ আমাদের প্রতিবেশী বা নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোতে প্রায় নিয়মিতভাবে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে, এবং এর থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের উন্নত দেশগুলোও বাদ যাচ্ছে না, তখন আমরা এদেশের নাগরিকরা ওসব খবর শুনে বা দেখে শিউরে উঠে ভাবি পশুর নৃশংসতাও হার মানছে ওসব দেশের নরপশুদের কাছে। কিন্তু, আমরা ওদের মতো নই এই গর্ব ধুলায় লুটাল গত জুলাইয়ের ঐ নারকীয় ঘটনায়। শেষ পর্যন্ত আমরাও কি ভিন্ন কৃষ্টি, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অসহিষ্ণু এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ধর্মীয় ঘৃণাবোধের বিশ্বায়নের শিকার হয়ে গেলাম? আমরাতো এমন নই, এমন ছিলাম না কখনো, তবে কী করে ঘটতে পারল এহেন পৈশাচিক ঘটনা আমাদের দেশে আমাদেরই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা? আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের হিসেবের বাইরে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে ফেলছি? প্রযুক্তি ও পেশাগত ব্যস্ততা কি ওদের আর আমাদের মধ্যে বিপজ্জনক দূরত্ব তৈরি করে দিচ্ছে? যে কোনো বিষয়ে পারস্পরিক সহনশীলতা, বিনয়, ভদ্রতা, নৈতিকতার শিক্ষা কি আমাদের ভিতর থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে? এগুলো জরুরিভাবে ভাববার এটা উপযুক্ত সময় নয় কি?

সে যাহোক, সব মন্দ বিষয়েরই একটা ভালো দিক থাকে, তা হলো তা থেকে শিক্ষা নেয়া। আশা করি সেই শিক্ষা আমাদের হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেভাবে আমরা জয় করি এই

ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে এদেশে আর কখনোই এসব ঘটবে না তার নিশ্চয়তা বিধান করতে আমরা নিশ্চয়ই সক্ষম হব। দেশকে বাঁচাতে, নিজেদেরকে বাঁচাতে এটা নিশ্চিত করতেই হবে।

চল্লিশ লক্ষেরও বেশি সরাসরি কর্মসংস্থানসহ গত অর্থবছরে আটাশ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করা দেশের প্রায় একাশি শতাংশ রপ্তানি আয়ের তৈরী-পোশাক শিল্পটিকে গুটিকতক বিপথগামিদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে ছেড়ে দেয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। ঘটনার পরে দেশের সাধারণ জনগণ, সরকারসহ অন্য সবার সময়োপযোগী ও যথার্থ ভূমিকায় এক্ষেত্রে আশার সঞ্চার হয়েছে। আমাদের দেশে অবশ্য এটাই স্বাভাবিক।

সব প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েও দেশ কিন্তু এগোচ্ছে, ভালোভাবেই এগোচ্ছে। শুধু তৈরী-পোশাক শিল্পই নয়, অন্যান্য নানান শিল্পও গতি ও প্রাণ ফিরে পাচ্ছে একটু একটু করে। কী আশার কথাই না এটা! দেশের এই প্রধান শিল্পটি সুস্বাস্থ্যে টিকে থাকলে তা আরো কত শিল্পের জন্ম দিতে পারে তার প্রমাণ অনেক আগেই আমরা পেয়েছি। কাজেই বৃহত্তর স্বার্থেই গার্মেন্ট শিল্পকে শুধু টিকিয়েই রাখতে হবে তা নয়, এটাকে যত্নে বড় করতে হবে। এই শিল্পের সুরক্ষার জন্য অনেক বড় বড় কাজ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এটি চলতে থাকবে, কারণ এদেশে গার্মেন্ট শিল্প সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ ও উদাহরণ হয়ে দীর্ঘকাল টিকে থাকবে মাথা উঁচু করে, আরো বড় হবে সময়ের সাথে সাথে।

ব্যাবিলনেও আমরা সেই চেষ্টাই করছি আমাদের সাধ্যানুযায়ী। ব্যাবিলন পরিবারের প্রায় বারো হাজার বা ততোধিক সরাসরি সদস্য দেশের দক্ষ ও সুনাগরিক হওয়ার পাঠ নিচ্ছেন সদাসর্বদাই। এদের কাছ থেকে নৈতিক শিক্ষা পেয়ে উচ্চ শিক্ষার দিকে এগোচ্ছে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। আর সেই ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি শেষ করে কেউ কেউ আবার ব্যাবিলনে এসে উচ্চ পদে কাজ করছে, যেখানে একসময় তার মা বা বাবা হয়তো কোনো অপেক্ষাকৃত নিম্নপদে কাজ করে আজ তার এক সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণে সহায়ক হয়েছেন। এই গর্ব শুধু সেসব বাবা-মায়েরই নয়, এই গর্ব ব্যাবিলনেরসহ গোটা জাতিরও। এধরনের সফল গাঁথা আগামীতে ব্যাবিলন কথকতার পাতায় কেউ নিয়ে আসবেন সেটা আশা করছি।

ব্যাবিলন কথকতার গত দশ বছর পূর্তির বিশেষ সংখ্যাটির মোড়ক-উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন মাননীয়া রাশেদা কে. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন ও সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার-২০০৮। এর আগে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসা অন্য সবার মতো তিনিও ব্যাবিলনে এসে অবাক হয়েছিলেন পর্দার আড়ালে বস্ত্রশিল্পের প্রচলিত চেহারার বাইরে ভিন্ন কিছুর স্বাদ পেয়ে। তাঁর

আগে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসা অন্য সবার মতো তিনিও ব্যাবিলনে এসে অবাক হয়েছিলেন পর্দার আড়ালে বস্ত্রশিল্পের প্রচলিত চেহারার বাইরে ভিন্ন কিছুর স্বাদ পেয়ে। তাঁর বিস্ময়ও ছিল আনন্দ মিশ্রিত। এই শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারি-কর্মকর্তারা মিলে এক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে, এরা নাচ-গানসহ তাদের অন্যান্য সকল সুকুমারবৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এখানে, এটা তিনিও ভাবতে পারেননি। আজকাল অনেক গার্মেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কমবেশি এসবের চর্চার চল হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তার খবর জানে না বললেই চলে। সংবাদ ও প্রচারমাধ্যমগুলো হয়তো এসব খবরকে প্রচারযোগ্য খবরই মনে করে না। তা হলে সেটা এক দুর্ভাগ্যই বটে।

২০১৬ সালটি ব্যবসার জন্য সেরা একটি বছর হবার সম্ভাবনা নিয়েই শুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ঠিক তেমন হলো না। যাহোক সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যে অংশ আমাদের হাতে নেই তা নিয়ে কোনো হতাশা নয়। সময় ভালোর দিকে বদলাবে এই বিশ্বাস রেখে আমরা ব্যাবিলনে আমাদের নিয়মিত সুচর্চাগুলো চালিয়ে গিয়েছি। শিক্ষাবৃত্তিও দেয়া হয়েছে যথারীতি, বৃত্তির প্রদেয় অর্থমান বাড়ানো হয়েছে, দুবছর অন্তর বৃত্তি দেয়া হতো তা এবছর থেকে প্রতিবছর করা হয়েছে। এজন্য ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ একটা ধন্যবাদ পেতে পারেন। অব্যাহত থেকেছে শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান, ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেসের রক্তদান ও চক্ষুশিবির কর্মসূচি। আমাদের ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাব সক্রিয় থেকেছে শত কাজের মাঝেও। নভেম্বর মাসে ক্লাবটির কিছু সদস্য সুন্দরবন সফর করেছে ছবি তোলার উদ্দেশ্যে। অসাধারণ কিছু ছবি তুলেছে তারা সেই সফরে গিয়ে।

ব্যাবিলন অভ্যন্তরে বহু আগে থেকেই নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চলে আসছে। বিভিন্ন কারিগরি বিষয়সহ নেতৃত্বপ্রদান, ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরিবেশের সুরক্ষা, উৎপাদন ও পণ্যের মান উন্নয়নসহ অনেক কিছুই রয়েছে এসব প্রশিক্ষণের তালিকায়। এসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকরা মূলত ব্যাবিলন সদস্য, তবে প্রযোজ্য হলে বাইরের প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেন আমাদের অনেকেই। কেউ কেউ এরই মধ্যে জাপানেও গিয়েছেন দুসপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে মানবসম্পদই আমাদের সেরা সম্পদ। এর উন্নয়নই আমাদের উন্নয়ন। সেই বিশ্বাসে আস্থা রেখে এবছর থেকে শুরু হয়েছে আমাদের সকল শীর্ষ ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও ইউনিট প্রধানদের ভাষা ও উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ। দেশের একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠান এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন ব্যাবিলনে এসে। এটা ছমাস মেয়াদি। অংশগ্রহণকারিরা প্রশিক্ষণ শেষে বিপুলভাবে উপকৃত হবেন তা বলাই বাহুল্য, সেই সাথে ব্যাবিলনও।

পরিশেষে, না বললে অন্যায় হবে যে গত কটি বছরের মতো এবারো এই সংখ্যাটি প্রকাশের

মিতু, রাসেল, তানজীন এদের আক্ষরিক অর্থেই শ্বাস ফেলবার সময় থাকে না আজকাল। তার মধ্যেই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির বলে এরা সময়মতোই সব করে ফেলেছে, ঠিকঠাক। পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এদেরকে? আমিও আছি আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ প্রচ্ছদশিল্পি ফারহানা রহমান সুরভী ও অক্ষর প্রিন্টার্সের কামাল ভাইসহ অপর সকলকে। ব্যাবিলন কথকতার এগারোতম সংখ্যাও পাঠক-পাঠিকার কাছে পেছনের সংখ্যাগুলোর মতোই সমাদৃত হবে এই কামনা করে সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। শুভ ইংরেজি নববর্ষ ২০১৭!

এসএম এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক
ডিসেম্বর ১৫, ২০১৬

# কথকতা-র হবু লেখক-লেখিকাদের জন্য

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

১১

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ও এ পর্যন্ত ব্যাবিলন কথকতা আয়োজিত লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি যে কিছু একটা লিখে ফেলার বাসনা কী প্রবল সবার মধ্যেই। কিন্তু হায়! লিখতে বসে কী বিড়ম্বনা– কিছুইতো নেমে আসে না মাথা থেকে কলমের ডগায়।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শেখাবেন শিক্ষক– এটাই দস্তুর, কিন্তু আমি আরেকজন শিক্ষার্থী হয়েও আজ লিখতে বসেছি কী করে লিখতে হয় সে সম্পর্কে আমার মতামত দিতে। এ আমার এক ধরনের নিরীক্ষা, আসলে একজন শিক্ষার্থীর পরামর্শে অপর একজনের কোনো লাভ হয় কি না। আমার ধারণা কিছুতো হয়ই, এই বিশ্বাসের কারণ হলো যে আমিতো অন্তত সবার কাছ থেকেই কিছু না কিছু শিখি বা শিখতে পারি।

লেখা–তা যে উদ্দেশ্যেই হোক তার মধ্যে সৃজনশীলতা থাকতেই পারে, আর এই সৃজনশীলতার প্রতি রয়েছে আমাদের এক ধরনের মোহ, ব্যাকূলতা। এই থাকাটা স্বাভাবিক, নির্দোষ এই মোহ। জগতে মানুষের পক্ষে তার সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রকাশের অজস্র উপায় রয়েছে। লিখনি তার মধ্যে একটা– আমার মতে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের তাতে সফল অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

আমরা যারা তৈরী পোশাকশিল্পের সাথে কর্মরত– শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা– লিখা ছাড়াও আমাদের সুযোগ রয়েছে সৃষ্টিশীল কিছু করা ও তা থেকে আনন্দ আহরণের। কর্মরত প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে নির্দিষ্ট করণীয়– হিসেব রাখা, প্রতিবেদন তৈরি করা, সব বিষয়ে সদা সতর্ক নজরদারি করা, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও খরচ কমানো বিষয়ে গবেষণা, নতুন পোশাক-আশাক ডিজাইন করা, সেলাই করা, কাপড় ইস্ত্রি করা, পোশাক ভাঁজ করা, এ রকম আরো কত কী। চট করে মনে হতে পারে এর ভেতরে সৃজনশীল কিছু করার সুযোগ কোথায়। কিন্তু আমার তো মনে হয় এ সবকিছুতেই করার কিছু থাকে। আপনার কাজটি আপনি খুব নিখুঁত ও দক্ষভাবে করার কিছু অনন্য কৌশল উদ্ভাবন করতেই পারেন যা অন্যদের থেকে কিছুটা হলেও আলাদা। আপনার এই স্বকীয়তাকেই আমি আপনার উদ্ভাবন

বলব। তবে কথা হলো এসব যেন অস্থায়ী। এসব কীর্তিকে মোড়কে পুরে রেখে দেয়া যায় না সেগুলো আবার ভবিষ্যতে ফিরে ফিরে দেখার জন্য, বা অন্যকে দেখাবার জন্য, যদি মন চায় (মনতো চায়ই)। সেক্ষেত্রেই আমাদের মতো সাধারণদের জন্য লেখালেখিটা খুব উপযোগী মনে করি। আমরা চলে যাবো কিন্তু আমাদের লেখা থেকে যাবে।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, লিখব কী করে। লিখতে চাই কিন্তু পারিতো না। আসে না কিছুই। গল্প লিখতে চাই তো জানা বা আগে পড়া অন্যের লেখা গল্পের কথাই শুধু মাথায় আসে। প্রবন্ধ? সেও তো একই। কোনো বিষয়ের উপর লিখার পর্যাপ্ত জ্ঞানই বা কোথায়? কবিতা, ছড়া? তাও সম্ভব হয় না। দুটো লাইন ছন্দ মিলিয়ে লিখি কিন্তু এর পর আর মেলে না। বেশিরভাগ সময় লিখব ভেবে ভেবেই দিন, সপ্তাহ, মাস চলে যায়। মাথায় যুতসই কিছু আসে না বলে বসাই হয় না।

একটা কথা আছে না– শুরু করাটাই পুরো কাজের অর্ধেকটা? এটা বড় সত্য একটা কথা, বড়ই কার্যকর। সাদা কাগজে একটা সাধারণ আঁক কষার পর কে আর বসে থাকে? সেই আঁকের সাথে আঁক যোগ করে কিছু একটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলেই। সফলতাও আসে।

পড়তে হবে– হ্যাঁ, পড়তে হবে মন দিয়ে। স্বীকৃত লেখক-লেখিকারা কীভাবে লেখেন তা পড়তে হবে, শিখতে হবে সেসব পড়ে, বুঝে পড়তে হবে। বানান, ব্যাকরণের ব্যবহার জানতে হবে। লেখার সময় সবচেয়ে বড় বিপদ হয় ক্রিয়াপদের প্রয়োগে, বানানে আর সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণে– এছাড়া রয়েছে যতিচিহ্ন বা দাঁড়ি কমার ব্যবহারের বিড়ম্বনা। এগুলো শিখতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। গদ্য পদ্য লেখার জন্য সৈয়দ শামছুল হকের 'মার্জিনে মন্তব্য' বইটি অবশ্য পড়া দরকার। দারুণ উপকারী বই এটি লেখালেখিতে আগ্রহীদের জন্য। এরকম অন্য কারো বইও থাকতে পারে, তবে থাকলেও তা আমার জানা নেই।

ছড়া বা কবিতা রচনা যাদের লক্ষ্য তাদের জন্য আমার বক্তব্য অতি সাধারণ, কবিতার জগতে আমার প্রবেশ-যোগ্যতা নেই। কবিতা রচনার স্পর্ধাই আমার নেই, শুধু এটুকু বলতে পারি যে ছড়াতেতো অবশ্যই, কবিতাতেও ছন্দমিল না থাকলে তা ভালো লাগার কথা নয়। ছড়া-কবিতার ছন্দমিলটাই সব সেটাও ঠিক নয় আবার। যা লিখবেন তার একটা মানে থাকা চাই, বক্তব্য থাকা চাই সুস্পষ্ট। কোনোমতে পদ মিলানোই যথেষ্ট নয়। ছড়া-কবিতা লিখে আবৃত্তি করবেন যেন অন্য কারো রচনা পড়ছেন। একাধিকবার আবৃত্তি করুন, শুনুন নিজের কানে তা কেমন শোনাচ্ছে। ছন্দে পতন বা অমিল টের পেয়ে যাবেন, যদি থাকে।

গদ্য রচনার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন বেশ কঠিন লাগতে পারে অনেকের কাছেই, যেমন আমার হয়। আমার এই লেখা– যারা ইতিমধ্যে লেখালেখির বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছেন– তাদের জন্য নয় মোটেই, তাই নিতান্তই নবিশদের উদ্দেশ্যে দুচার কথা বলতে সাহস করি।

জানি, শুনতে বা বলতে যত সহজ আদতে কাজটা অত সহজ নয়। কথাটা আমিও বলি, অন্যরাও বলেন যে আপনার আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেই লেখার উপাদান বা

বিষয়বস্তু ছেঁকে নেয়া যায়। আপনার পথচলায়, কর্মক্ষেত্রে, গ্রামে-গঞ্জে-পার্কে, নদীর পাড়ে– সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে বা থাকে কোনো না কোনো গল্প বা কাহিনী। অনেক সময় আমরা খেয়াল করি না যে চোখের সামনেই মজার কিছু ঘটে চলেছে। গল্প লেখার ইচ্ছে হলে মানুষের সাথে মেশা দরকার, দরকার তাদের জীবনের গল্প শোনার। আমরা বস্ত্রশিল্পে কর্মকর্তারা সেদিক থেকে বেশ সুবিধেজনক অবস্থায়। হাজারো চরিত্র মিশে থাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে। গ্রামগঞ্জ থেকে ভাগ্য ফেরাবার লক্ষ্যে আসা মানুষগুলোর জীবনে কত সুখ-দুঃখের কাহিনীই না থাকতে পারে যা নিয়ে গল্প হতে পারে। সুপারভাইজার, ম্যানেজার, উপরস্থ কর্মকর্তা- এদের ব্যবহার, দুর্ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা, মহত্ত্ব– এসব নিয়েও রচিত হতে পারে পাঠযোগ্য হৃদয়স্পর্শী কোনো লেখা। ছুটি-ছাটায় গ্রামে বেড়াতে গেলে সেখানকার ঘটনা ও প্রকৃতির বর্ণনাও হতে পারে মজার কোনো গল্পকাহিনী।

জীবন থেকে গল্প বের করে নিতে হলে অন্যদের সাথে মেশার সংকোচ কাটিয়ে ওঠা দরকার। কারো কারো জন্য এটা সহজ নয় আবার খুব কঠিন কাজও হবার কথা নয়। কাজের অবসরে সহকর্মীদের কারো সাথে এমনিতে কত কথাই হয়। সচেতন থাকলে একটা গল্প বের করে নেবার জন্য কৌশল করে সেরকম প্রশ্ন করা যেতে পারে তাকে।

রিক্সাচালকদের নিয়ে অনেকেই সত্য ও কল্পনার মিশেল দিয়ে গল্প লিখেছেন। আমিও এরকম একটা লিখেছিলাম আমাদের এই পত্রিকার বিগত এক সংখ্যার জন্য। এইরকম আর একজন রিক্সাচালকের দেখা মিলেছিল অনেক আগে একদিন। আমি তখন নিউ এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত একটি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করি, থাকি উত্তর শাজাহানপুরের এক ভাড়া বাড়িতে। কাজ শেষে রিক্সাযোগেই বাসায় যাই (তখনকার দিনে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য বাসের ব্যবস্থা থাকলেও ফ্যাক্টরির উপরতলার ম্যানেজারদেরকে গাড়িতে করে আনা নেয়ার তেমন চল হয়নি)। কাজ শেষে একদিন রাতে বাসায় ফিরছি আর ভাবছি নানান কথা। কারখানার শ্রমিকদের অস্বাভাবিক হারে অনুপস্থিতি, কাজের মান, সময়মতো শিপমেন্ট রেডি না হবার আশঙ্কা, ক্রেতাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, বাসায় আমার তিন-চার মাসের শিশু কন্যার ঘুমন্ত মুখের কাল্পনিক দৃশ্য– সব ভাবনা শেষ করে একসময় হঠাৎ মনে পড়ল ভাড়া করার সময় রিক্সাওয়ালাকে দেখে একটু কেমন যেন মনে হয়েছিল। দাড়িওয়ালা, মাথায় গোল টুপি পরা মাঝবয়সী লোকটাকে সচরাচর যে ধরনের রিক্সাওয়ালাদের দেখি তাদের থেকে একটু আলাদা লেগেছে। লোকটার তাকানোর মধ্যে কিছু একটা ছিল। আমার স্বভাব নয় যেচে পড়ে কারো সাথে আলাপের, তাও সেদিন এক অদম্য কৌতূহল থেকে জানতে চাইলাম লোকটার নাম।

রমজান, স্যার।

বাড়ি?

উজিরপুর।

ঢাকায় কতদিন?

নয় বছর, স্যার।

এইভাবে কথা এগোয়। একটু একটু করে ওর জীবনের কিছু চমকে যাবার মত কাহিনী জানা

হয়ে যায় আমার। গরীব বাবা-মায়ের দশ সন্তানের সাত নম্বর ছেলে ভাগ্যবান হতে পারতো, কিন্তু রমজানের ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। পড়াশুনা বলতে বছরদুয়েক মাদরাসায় পড়া। ছোটবেলার বন্ধুদের একজন আকরাম। এর সাথেই ছিল তার দোস্তি সবচেয়ে বেশি। গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকদের ক্ষেত-খামারে কাজ করত দুজনেই। আকরাম দেখতে সুন্দর ছিল। গায়ের রং ফরসার দিকে, টানা টানা চোখ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। রমজানের পরের বোনটি হালিমা। সেও দেখতে বেশ ফুটফুটে। মায়ায় ভরা দুটি চোখ, খাড়া নাক। ছিপছিপে গড়নের দশ- এগারো বছরের হালিমাকে দেখলে একটু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করেই। আকরাম ওকে একটু আলাদা চোখে দেখতে শুরু করেছিল এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি রমজানের, আপত্তিও করেনি সে। দেখতে সুন্দর ছাড়াও আকরামের কিছু গুণও ছিল। ভালো ফুটবল খেলত। দূরের গ্রাম থেকেও ডাক আসত তার অন্য দলের হয়ে খেলতে। তার আরেকটা গুণ হলো আঁড়বাঁশি বাজাতে পারতো সে বেশ ভালো। চৈত্রের অলস দুপুরে আমগাছের ছায়ায় বন্ধুরা জুটতো আর আকরামকে তার বাঁশিতে ফুঁ দিতে বলত। এভাবে একদিন ওরা বড় হয়ে গেল, হালিমাও ডাগর হলো বেশ। সেরকম সময় একদিন ঘটনাটা ঘটল। হালিমা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হলো, ওদিকে আকরামেরও খোঁজ নেই। গ্রামে, পাশের গ্রামগুলোতে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজা হল। লাভ হলো না। আকরামের সঙ্গেই যে হালিমা গিয়েছে এ বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না। তারপর একদিন হঠাৎ যেভাবে নিখোঁজ হয়েছিল সেভাবেই ফিরে এল হালিমা, একা। না, ঠিক একাও নয়। আকরামের সাথেই গিয়েছিল হালিমা, কিন্তু তাকে সঙ্গে করে ফিরতে পারেনি। হ্যাঁ, ঢাকাতেই নিয়ে এসেছিল আকরাম হালিমাকে। কোনো বস্তিতে বাসা ভাড়া করে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে থাকতে শুরু করেছিল তারা। আকরাম কোনো গার্মেন্টস কারখানায় চাকরিও পেয়ে গিয়েছিল। হালিমার তখন চাকরির বয়স হয়নি। মাস ছয়েক কেটে যাবার পর একদিন যেভাবে দুজনে তাদের গ্রাম থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তেমনি করে এবার আকরাম হারিয়ে গেল হালিমার জীবন থেকে। হালিমার চাইতেও সুন্দরী কারো সঙ্গে তার ভাব হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। বড় বিশ্বাস করতো রমজান তার বন্ধুটিকে, ভালোও বাসত। ওরা দুজন একসাথে পালিয়ে গেলে সে ভেবেছে এরতো কোনো দরকার ছিল না। হালিমার সাথে আকরামকে নিয়ে সে নিজেইতো পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছিল মনে মনে। নিরীহ ফুটফুটে বোনটির জন্য আকরাম যে একসময় একজন সুপাত্রই হতো এ ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। আর কটা দিন পরে হয়তো সে নিজেই বিষয়টা তুলত প্রিয় বন্ধুর কাছে– মুরুব্বিদের কাছে। তাই ওদেরকে যখন আর পাওয়া গেল না, সবাই ধরেই নিলো যে আকরাম হালিমা কোথাও একসাথেই আছে। রমজান একসময় পুরো ব্যাপারটা মেনে নিলো এই ভেবে যে আজ হোক, কাল হোক এমনটাইতো হতো। যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক ওরা, সুখে থাকুক। মা-বাবা, বড় ভাইবোনদেরকেও সেরকমই বুঝিয়েছিল সে।

হালিমার আর বিয়ে হবার উপায় নেই, কেবল সেই আকরামের সাথে ছাড়া। হালিমার কান্না, বাবার বোবা চেহারা, মায়ের মাতম রমজানের হৃদয়ে আকরামের জন্য রাখা

এতকালের সঞ্চিত ভালোবাসা, যা জমাট বেঁধেছিল একরকম অভিমানে, তা যেন এখন গোখরো সাপের সবটুকু বিষ নিয়ে ক্রুদ্ধ ফণা তুলে বেরিয়ে এসে ছোবলের পর ছোবল মারতে চাইলো আকরামকে। নিজের অজান্তেই সে সংকল্পবদ্ধ হয়ে গেল- হারামজাদাটাকে সে খুঁজে বার করবেই। না, ওকে ধরে এনে হালিমার কাছে সঁপে দেবে, তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে– এরকম ভাবনা তার মাথায় ছিল না। সে জানত এসব করে হালিমার বা তাদের পরিবারের যে ক্ষতি এরই মধ্যে হয়ে গেছে তা পোষাবার নয়। খুন করবে সে আকরামকে।

বাসার একেবারে কাছে চলে এসেছি, এর পরে কী হয়েছিল তা সবিস্তারে শোনার সময় হবে না।

তা, রমজান, ইয়ে, মানে শেষ পর্যন্ত...

মানে আকরামকে আমি খুন করেছিলাম কি না? হ্যাঁ, করেছিতো।

বল কী? তা...

প্রমাণ নেই তাও আমাকে ধরে জেলে ভরে দিলো। পাঁচ বছর পর বেরিয়ে এসে ঢাকা শহরে রিক্সা চালাই।

গল্প শোনার আগ্রহ আমার তখন সম্পূর্ণ উবে গিয়েছে। বাকি পথ চুপ মেরে থাকি। হঠাৎ নীরব হয়ে যাওয়াটা অস্বস্তিকর ছিল বটে কিন্তু তাও মুখ বুঁজেই থাকি। বাসার সামনে চলে এলে রিক্সা থামিয়ে তাড়াতাড়ি করে নেমে ভাড়ার টাকা বাড়িয়ে দেই। ভাংতি ফেরত নেয়ার অপেক্ষা না করেই সরুৎ করে ছোট গেট গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে হাঁপ ছাড়ি।

এই যে গল্পটা, আপনারা ভাবছেন সব রিক্সাওয়ালার কাছে এমন কাহিনী থাকবে তার কী নিশ্চয়তা। না, তা নেই। তবে বলছি শুনুন, উপরের টুকরো গল্পটার পুরোটা সত্যি নয়। বাস্তবে যা হয়েছিল তা হচ্ছে– সেদিন রিক্সাওয়ালার সাথে আলাপ জোড়ার প্রস্তুতিতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ততক্ষণে আসলে রিক্সা আমাদের বাসার কাছে সরু গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ফলে অতটা লম্বা আলাপের মোটেও সুযোগ ছিল না।

নাম, স্যার.... (নাম বলেছিল, আজ আর তা আমার মনে নেই)

গ্রাম?

(বলেছিল, কিন্তু সেটাও মনে পড়ছে না আজ)

ঢাকায় এলে কেন?

গ্রামে একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম, স্যার।

কথাটা এতটাই অপ্রত্যাশিত, এতই আকস্মিক, বিদঘুটে ও অবিশ্বাস্য লেগেছিল যে আমি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে বাকিটা সময় রিক্সাতে চুপচাপ বসেছিলাম আর প্রহর গুণছিলাম কখন বাসায় পৌঁছাব। একজন খুনির রিক্সায় চেপে বাসায় আসার চমক ছাপিয়ে কিছুটা ভয় যে আমাকে পেয়ে বসেনি সে কথা হলফ করে বলতে পারব না। কাজেই মনের কৌতূহলকে মনের মধ্যেই গলা টিপে দিয়ে বসে রইলাম। সত্যি সত্যি এতটুকুই গল্প– বা কোনো গল্পই না– শুধুই একটা গল্পের ইঙ্গিত। এর বাইরে যা কিছু পড়লেন কাহিনীটিতে সেসব এইমাত্র লিখতে লিখতে কল্পনা থেকে তৈরী করে নিলাম। আরেকটা ঘটনা বলতে

পারি আপনাদের।

রান্নাবান্না, ঘর পরিস্কার রাখা, গাছে নিয়মিত পানি দেয়া, মেহমানদারিতে সহযোগিতা করা– এসব কাজের জন্য আমাদের বাসায় দুজন মহিলা ও দুজন পুরুষ কাজ করে। এরা আমাদের সাথেই থাকে। পুরুষ দুজনের বয়স কম। একজনের উনিশ, অপরজনের তেইশ। ছোটটি, যার নাম মোবারক, একদিন বাড়ি থেকে ফোন পেল যে তার মায়ের ভীষণ অসুখ। সে ছলছল চোখে এসে আমার স্ত্রীর কাছে ছুটি চাইলো। এরপরের ঘটনা সচরারচর যেরকম ঘটে সেরকমই। আমার স্ত্রী মোটেই বিশ্বাস করেননি মোবারকের মায়ের অসুখের কথা। এদের বাড়ি যেতে মন চাইলেই এরা তাদের মা-বাবাকে অসুস্থ বানাবে, বা নানা-নানিকে মেরে ফেলবে। অনেক সময় এদের খেয়ালও থাকে না যে নানিটিকে এর আগেও একবার মেরেছে। কাজেই ওর ছুটি হলো না। এরপর নিয়ম অনুযায়ী ছেলেটির আমার কাছে আসার কথা। হলোও তাই। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা পুঁজি করে আমার স্ত্রীর সন্দেহ থেকে নেয়া সিদ্ধান্তে আমার কোনো অশ্রদ্ধা নেই। তাও ছেলেটির চোখের পানি দেখে আমি নরম হয়ে যাই। আমার যুক্তিবাদী মন বলে– সত্যিই যদি মোবারকের মায়ের ভীষণ অসুখ হয়ে থাকে? সে ছুটি পেল না, বাড়িতে যেতে পারল না, ওদিকে মা যদি ওর মরে যায়? তাহলে কী হবে? এই ঝুঁকি আমি নিতে চাই না, তা যদি ও মিথ্যেও বলে থাকে। আমার স্ত্রীকে এসব বিষয় বুঝানো সহজ নয়, কাজেই এক সময় আমি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে মোবারককে ছুটি দিয়ে দেই। বাড়তি কিছু টাকা দিয়ে দেই ওর মায়ের সম্ভাব্য চিকিৎসার জন্য। ভাবি, কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে হলেও ও ফিরে আসবে। ছেলেটা বেশ কাজের, আর এজন্যেই আমার স্ত্রী ওকে ছাড়তে চান না। বলতে গেলে বাসার কাজে মোবারক আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী। অপরদিকে আলিটা বোকা ও অলস। ওকে বোধহয় বেশিদিন রাখা হবে না। মোবারককে আরো কিছু টাকা দেই আসার সময় কটা হিমসাগরের চারা নিয়ে আসার জন্য। এটা ঠিক আমার চাহিদা নয়, আমার স্ত্রীর। কিছুদিন আগে এ নিয়ে তাঁকে মোবারকের সাথে আলাপ করতে শুনেছি। আশা জাগে এতে যদি ওঁর মনটা মোবারকের প্রতি একটু নরম হয়। মোবারকদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের কোথাও।

পাঁচদিন হয়ে গেছে মোবারকের কোনো খবর নেই, বা তার পক্ষ থেকে অন্য কেউও যোগাযোগ করেনি। সে ফিরে আসেনি। এত তাড়াতাড়ি অবশ্য আসার কথাও নয়। ওর মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ওদের বাড়ির অন্য কারো ফোন থেকে থাকলেও সেই নাম্বার আমাদের জানা নেই। আমার স্ত্রী আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকান তাতে আর তাঁকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না। চেহারা দেখেই আমি সব অনুচ্চারিত কথা পড়তে পারি। বলেছিলাম না? ও যে গেলে আর ফিরবে না তা তো আমি আগেই জানি। কতবার তোমাকে বলেছি এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। এরা কখনো সত্যকথাটা বলে না। এত দরদ, এখন জোগাড় করো আরেকজন মোবারক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরো চারদিন পর সন্ধ্যার দিকে একটা বই নিয়ে বসেছিলাম আমি। আমার স্ত্রী গেছেন তাঁদের সমিতির এক মিটিংয়ে, শহরেরই কোনো হোটেলে। গেট থেকে সিকিউরিটি গার্ড ইন্টারকমে জানাল মোবারক এসেছে আমগাছের চারা নিয়ে। বই ফেলে ত্রস্তে উঠে

পড়ি আমি।
ওকে পাঠান আমার কাছে।
একটু পরেই মুখোমুখি হই মোবারকের। চোখমুখ কঠিন করে জিজ্ঞেস করি–
কী হয়েছিল তোর, যোগাযোগ করিসনি কেন?
মোবারকের কাহিনী হলো– মায়ের অসুখ কথাটা আসলেই সত্যি নয়। আসল ব্যাপার হলো ওর পিঠাপিঠি ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে, কাজেই তাকে তো যেতেই হতো। তা, ওর বাড়ি থেকে সত্যি কথাটা বললেইতো হতো। না, তারা ভেবেছে ঢাকা শহরের মানুষেরা বাবা-মায়ের অসুখেই ছুটি দিতে চায় না, সেখানে ভাই বা বোনের বিয়েতো তাদের কাছে অতি তুচ্ছ বিষয়। ভিতরে ভিতরে এই যুক্তি আমি অস্বীকার করতেও পারি না। যাহোক, সুখবরটা দেবার জন্য আমি স্ত্রীর নাম্বারে ফোন করি। ফোনটি এখন বন্ধ আছে।

আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকা, কেমন লাগল মোবারক-কাহিনী? যাদের কাছে খারাপ লাগেনি তাদের উদ্দেশ্যে বলি– এমনটি মোটেও আমাদের বাসায় ঘটেনি এ পর্যন্ত। কিন্তু কখনো ঘটতেই পারে। সেরকম কল্পনা থেকে এই মাত্র তৈরী করা অতি সাধারণ একটি গল্প আপনাদের জন্য। অতি সাধারণ, তাও গল্পতো। এরকম আরেকটা।

কুদ্দুস (পুরো নাম জানা নেই, দরকারও নেই) ময়মনসিংহের বিশেষ এক অঞ্চলের লোক। পেশায় সে ডাকাত। সম্প্রতি এক বিশাল সমস্যা হয়েছে তার। লোভে পড়ে এক ডাকাতির লুট একা হজম করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। এরকম ঘটনা আগেও দুবার ঘটেছে তাই দলের অন্য সবার সাথে একমত হয়ে ডাকাত-সর্দার দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে কুদ্দুসকে। শুধু দল থেকে বললে ভুল হবে, এলাকা থেকেই বিতাড়িত করা হয়েছে তাকে। এই নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারুর নেই দলে, কুদ্দুসেরও ছিল না। জীবনের মায়া ডাকাতদেরও আছে। ময়মনসিংহের ভেতরে সে অন্য কোনো ডাকাত-দলে ঢুকতে পারবে না, একাও কোনো অপারেশন করতে পারবে না। দারুণ ঝামেলায় পড়ে গেল কুদ্দুস। প্রায় অর্ধাহার অনাহারে কাটতে লাগল দিন। এ দুনিয়ায় সে একটাই কাজ জানে, সেটা ডাকাতি। চুরিতে সে অভ্যস্ত নয়, রুচিতেও বাধে।
ময়মনসিংহ ছেড়ে ঢাকা চলে এল সে। এসে অল্পদিনেই বুঝতে পারল এখানে পুলিশের ঝুঁকি অনেক বেশি। কীভাবে একসময় সে লঞ্চে চেপে বরিশাল শহরে চলে এল। ক্ষিদের জ্বালা বড় জ্বালা। যে মানুষটার কাছে চুরি অসম্মানের সে একদিন ভিক্ষে করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে লাগল। কিন্তু এই জীবন মোটেই মেনে নিতে পারছিল না সে। টুকিটাকি কাজ জোগাড় করতে চেষ্টা করল, যেমন লাকড়ি চেরাই করা, বা রিক্সা চালানো। কিন্তু তার বিশাল দৈত্যের মতো ডাকাতে চেহারা দেখেই হয়তো কেউই তাকে কাজ দিতে সাহস করেনি। তাই একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে এভাবে আর চলবে না, ডাকাতিই করবে সে। বরিশাল তার জন্য একেবারে নতুন জায়গা। লোক ভিড়িয়ে দল গঠন সহজ হবে না। যা করার একাই করতে হবে। গত কটা দিন সে বটতলা এলাকা থেকে গোড়াচাঁদ দাস লেন ঘুরে দেখেছে ভিক্ষে করতে করতে। অবশেষে রাস্তা থেকে একটু দূরে অবস্থিত একটা একতলা পাকা বাড়ি বাছাই করল সে। বাড়িটা বেশ উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। চুন-সুড়কি

দিয়ে গেঁথে ওঠানো দেয়ালের ইটের ওপর সবুজ শেওলা জমে আছে। এটা যে সময়ের কথা তখন বরিশাল শহরে পাকা বসত- বাড়ির সংখ্যা হাতে গোনা ক'টি মাত্র। বেশির ভাগ বাড়ি-ঘরই টিন, কাঠ, বাঁশের তৈরী। পাকা বাড়ি মানে পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ি। কুদ্দুস এ ক'দিনে বেশ বুঝেছে যে বাড়ির পুরুষ মানুষেরা ছুটির দিন ছাড়া দিনের বেলা কেউই বাসায় থাকে না, এমনকি দুপুরে খেতে পর্যন্ত আসে না বাসায়। সকালে দশটার দিকে সে কাজটা করবে এই বাড়িতে, সিদ্ধান্ত নিলো। বাড়ির দু-তিনটে মহিলা ও ছেলে ছোকরা অায়ত্তে এনে কাজটা করা মোটেই কঠিন হবে না তার জন্য। ছফুটের মত লম্বা মজবুত শরীর তার। গায়ের রং বেজায় কালো। দেখতে ভয়ালদর্শন সে। সামনের সোমবারটাকে বাছাই করল সে অপারেশনের দিন হিসেবে।

ভিক্ষা দেনগো আম্মা– বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পাচিলের ভিজিয়ে রাখা দুপাল্লার কাঠের গেট ঠেলে ভেতরের আঙিনায় ঢুকে পড়ল সে। সেখানে তখন ছয়-সাত বছর বয়সী তিনটি বালক ছোট একটা প্লাস্টিকের বল নিয়ে খেলা করছে। বাইরে থেকেই কুদ্দুস এদের চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছে। ভিক্ষা দেনগো আম্মা, গরীবরে একটু ভিক্ষা দেন– আওড়াতে থাকল সে। মুখ আর চোখ ঘুরিয়ে একতলা বাড়িটির দরজা জানালার অবস্থা ও অবস্থান খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। এদিকে হঠাৎ করে এমন এক দশাসই চেহারার লোক গেটের দরজা খুলে ঘরের সামনে উঠোনে চলে আসায় তিন বালক খেলা থামিয়ে প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে আগন্তুককে দেখতে লাগল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল তারা কুদ্দুসের দিকে। তার অস্বাভাবিক দীর্ঘ আকৃতি দেখে প্রথমে একটু থমকে গেলেও পরে তাদের কৌতূহল জয়ী হলো। ভিক্ষে আদায়ের কৌশল হিসেবে কুদ্দুস আজ তার পেটের ওপর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গোল করে কাদামাটি লেপটে এসেছে। উর্ধাঙ্গ তার একেবারে আভরণহীন, নিম্নাঙ্গে উঁচু করে পরা লুঙ্গি। বালকদের আকর্ষণ তার মাটি মাখা ঈষৎ ফুলে থাকা পেটটি। এমন দৃশ্য এর আগে তারা আর দেখেনি। এই, পেটে তুমি কী মেখেছ?

অষুধ, আব্বা। পেটে বড় বেদনা।

তিনটি বালক তিন বাড়ির। এরা পরস্পরের খেলার সাথী। আজ কী কারণে তাদের স্কুল নেই। এই বাড়ির ছেলেটির নাম ইমতিয়াজ, সবাই ডাকে ইমু বলে। রোকন থাকে ইমুদের পাশের বাড়িতে, রবিন এসেছে রাস্তার ওপারের এক বাড়ি থেকে। এই ছেলেটির মন অস্বাভাবিক নরম। কুদ্দুসকে ওরকম পেটে মাটি মাখা দেখে রবিনের কচি মন তার প্রতি দরদে সিক্ত হয়ে গেল। সে হঠাৎ ছুটে এসে কুদ্দুসের একটা হাত টেনে ধরে বলল, চলো আমার সাথে আমাদের বাসায়। মাকে বলব তোমাকে ভিক্ষা দিতে। এই বলে সে সত্যি সত্যি কুদ্দুসের হাত ধরে টানতে শুরু করে দিলো গেটের দিকে। তখন হলো এক মজার দৃশ্য। এবার ইমু, রোকনও বাদ থাকল না। ওরা দুজনও এসে ভিখিরিটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিলো। প্রত্যেকে চাইছে কে কার আগে লোকটাকে তাদের বাসায় নিয়ে গিয়ে ভিক্ষা দেবে। এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা কুদ্দুসকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে দিলো। সে তো আর ভিক্ষের উদ্দেশ্যে আসেনি। সে এসেছে কায়দা করে ভিক্ষের নাম করে বাড়িতে ঢুকে বাড়ির লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে মহিলাদের শাড়ি-টাড়ি দিয়ে হাত-পা ও মুখ

বেঁধে ফেলে রেখে বাড়ি থেকে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা যা আছে সব নিয়ে কেটে পড়তে। এখন তাকে ভিক্ষে দেবার জন্য বাচ্চাগুলোর এই আন্তরিক ব্যগ্রতা দেখে সে একটু দ্বিধায়ই পড়ে গেল। ডাকাতি করতে এসে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তার সংক্ষিপ্ত ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হলো চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও সাধারণত লোকে ভিক্ষা দিতে চায় না। বেশিরভাগ সময় মাফ করো, মাফ করো, বলে বিদায় করে দেয়। বাচ্চা ছেলেরা কখনও কখনও নির্দয়ের মতো পরণের কাপড় টেনে ছিঁড়ে দিতে চায়, কখনও বা ঢিল ছোড়ে। কিন্তু আজ এদের হলো কী? তিনজনই তাকে ধরে টানছে কে কার আগে তাকে তাদের বাসায় নিয়ে ভিক্ষা দেবে। এটা তার বেশ অভিনব মনে হলো। কী করবে সে এখন? এরা সবাই এই বাড়ির না, অন্য বাড়ি থেকে এখানে খেলতে এসেছে ঠিক বুঝতে পারছে না সে। একজনকে মনে হয়েছে অন্য বাড়ি থেকে এসেছে।

বাবারা, আপনেরা সবাই এই বাড়িতে থাকেন?

ইমু ছাড়া বাকি দুজন মাথা নেড়ে জানাল– না, তারা এ বাড়ির নয়। সেই দুজন তাকে বাইরে টানছে, আর এবাড়ির ছেলেটি টানছে তাদের বাড়ির দিকে।

চলো, চলো আমার সাথে। তোমাকে অনেকগুলো চাল আর পয়সা দিতে বলব আম্মুকে। এরকম উভয় সঙ্কটে পড়ে সে একটু দিশেহারাই হয়ে পড়ল। ভাবল, এখন সে কী করবে। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাবে অন্য বাড়ির ছেলে দুটোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিবে, নাকি অন্য একদিন আসবে। এই সোরগোলে এরই মধ্যে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন বাড়ির কর্ত্রী, অন্তত কুদ্দুসের সেরকমই মনে হলো মহিলার বেশভূষা দেখে। এ বাড়ির ছেলেটি এবার দৌড়ে তার কাছে গিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কী সব বলল। মহিলা সব শুনে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন ও অল্প পরে ফিরে এলেন একটা পুরণো সার্ট, কিছু চাল (তখনকার দিনে চাল দেবার চল ছিল ভিক্ষে হিসেবে, এখন আছে কি না আমার জানা নেই) আর একটা আস্ত টাকা নিয়ে। এসব মিলে এবার কুদ্দুসের সবকিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। হঠাৎ তার মধ্যে প্রবল একটা ভাবান্তর ঘটে গেল। নাহ্, তার মতো কঠিন হৃদয় ডাকাতের পক্ষেও এবাড়িতে আর ডাকাতির চেষ্টা সম্ভব নয়।

এখানেও মূল ঘটনাটি ছিল বেশ অন্যরকম। গল্পের রবিন চরিত্রটি ছিলাম আমি। আমার য়স তখন পাঁচ-ছ বছরের বেশি নয়। একদিন রাস্তার ওপারে ইমুদের (আসল নাম নয়) বাসায় খেলছিলাম। তখন ওরকম উদোম পেটে মাটি লেপা লম্বা একটা লোক ভিক্ষার জন্য সত্যি সত্যি এসেছিল। ওকে দেখা মাত্রই ওর জন্য আমার কচি মন কেঁদে উঠেছিল। আমি ওর হাত ধরে টেনে আমার মার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। মা ওকে ভিক্ষে হিসেবে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি পরিমাণ চাল দিয়েছিলেন। তখন লোকটা এক ধরনের অদ্ভূত দৃষ্টি মেলে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিল– বাবা, আমারে ধইরা আইন্যা ভিক্ষা দিলেন! লোকটার সেদিনের ঐ দৃষ্টি আর কথাটি আজো আমার বেশ মনে আছে। ঐ স্মৃতি ঘিরে বাকি গল্প এইমাত্র বানালাম আপনাদের জন্য। ভালো লাগল? মোটামুটি, না? তাতেই চলে যাবে লেখার জগতে নবাগতদের।

পাকা লেখিয়েদের জন্য এসব হয়তো কোনো টিপস্‌ই নয়, কিঞ্চিত হাস্যকরও মনে

হতে পারে অনেকের কাছে। কিন্তু আগেই বলে নিয়েছি আমার এই প্রয়াস হলো ব্যাবিলন কথকতার সেসব পাঠক-পাঠিকার জন্য (সোহেলীর মতো) যারা কিছু লিখতে চান, আমাদের পত্রিকায় ছাপার হরফে দেখতে চান সেসব লেখা। এরা কেউ রন্ধন শিল্পী না হতে পারেন, রন্ধন কারিগর হতেতো বাধা নেই। সাধারণ চাল, ডাল, তেল, নুন সম্বল করে না গালিয়ে ঝরঝরে একমুঠো ভাত ফোটানো, লবনকাট্টা না করে একটু ডাল, না পুড়িয়ে একটু আলুভাজি করতে পারলেই চলবে তাদের। পরিবেশনযোগ্য রান্না হবে তা। তারপর কালে কালে একদিন কী রান্না করবে এরা তা কে বলতে পারে।

একটা কথা বলা হয়নি– নবীন বা হবু লেখকদের জন্য সবচেয়ে দরকারি একটা বিষয় হলো উৎসাহ। সঠিক সময়ে উপযুক্ত জায়গা থেকে আসা উৎসাহ অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারে, জমে পাথর হয়ে যাওয়া আলস্যকে ভেঙে খানখান করে দিতে পারে, যে লিখতে বসার জন্য কোনো তাগিদই অনুভব করে না কখনো সেও সময়ে অসময়ে লিখতে বসে যায় তখন। সময়েরও অভাব হয় না আর লেখার জন্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিশ্বাস করুন। অন্যকে উৎসাহ দিন, দেখবেন আপনিও সেটা পাবেন অন্যের কাছ থেকে। সবাই লিখুন, কিছু না কিছু।

# একটি আইডি কার্ড এবং মানবতা

প্রদীপ কুমার দত্ত
প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

১১

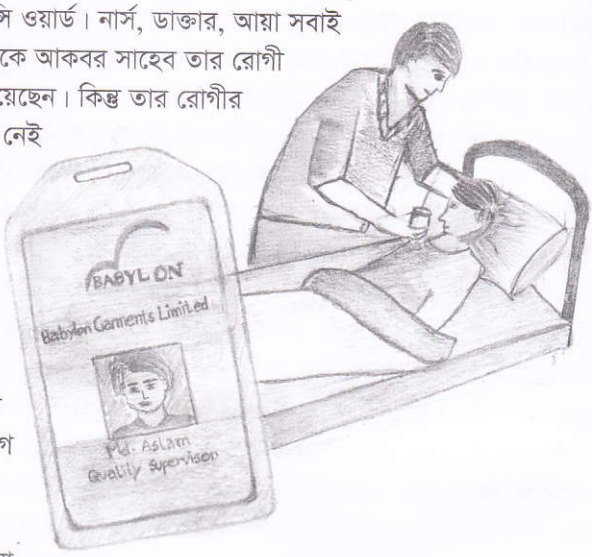


ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এর অভ্যন্তরে চারদিকে শুধু রোগী আর রোগী। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড। নার্স, ডাক্তার, আয়া সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। এদিকে আকবর সাহেব তার রোগী নিয়ে হাসপাতালে হাজির হয়েছেন। কিন্তু তার রোগীর দিকে খেয়াল করার ফুরসত নেই কারো। শেষ পর্যন্ত এক দালালের শরণাপন্ন হতে হলো। দালাল সুরুজ মিঞার সাথে দুই, এক কথা হতেই বুঝা গেল সে আকবর সাহেবের আনীত রোগী আসলামেরই এলাকার লোক। সে নিজে নিজেই আগ বাড়িয়ে হাসপাতলে রোগীর ভালো সেবা পেতে হলে কী করতে হবে এর ফিরিস্তি বর্ণনা করতে লাগল। সাথে সাথে প্রকাশ পেল তার আন্তরিতা ও সহমর্মিতা।

একটি বৃহৎ পোশাক শিল্পের কোয়ালিটি সুপারভাইজার মোহাম্মদ আসলাম। সেদিনও সে রাত দশটার দিকে সাব-কন্ট্রাকটেড ফ্যাক্টরি থেকে ইন্সপেকশন শেষে সাভার থেকে ঢাকার উদ্দেশে ফিরছিল। আসলামের মূল ফ্যাক্টরি ঢাকার মিরপুরে। হেঁটে হেঁটে স্বল্প দূরে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগুচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পিছন দিক থেকে কেউ আসছে, এমন সাড়া পাওয়া গেল। অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবে বিপদ বুঝে কিছুটা ইতস্তত বোধ করতে লাগল। কি করবে না করবে ভাবতে ভাবতেই পিছন থেকে আক্রমন। দুই ঘা ভারি কিছুর আঘাত পড়ল ঘাড়ে। দৌড় দিতে চাইল কিন্তু অন্ধকারে তাল সামলাতে না পেরে রাস্তার পাশের গাছের কাণ্ডে ধাক্কা খেলো। তারপর কি হলো, সে বলতে পারে না।

আসলাম যে ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন, সেই ফ্যাক্টরির জিএম জনাব আকবর সাহেব একটা মোবাইলের কল পেলেন– স্যার, আপনি কি জিএম স্যার বলছেন? অপরিচিত লোকের কল। কিন্তু খুবই উদ্বেগের স্বরে জানতে চাইলেন জিএম স্যার কি না।

হ্যা বলছি। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন আকবর।

উত্তর পেয়েই অন্য প্রান্ত থেকে বলতে লাগল– স্যার, আপনার ফ্যাক্টরির একজন স্টাফ, নাম আসলাম, তাকে অন্ধকারে কেউ মেরেছে। শক্ত আঘাত পেয়েছে। অজ্ঞান, অচেতন অবস্থায় আছে। আমরা রাস্তা থেকে তাকে উদ্ধার করে এখন সাভার বাজার সংলগ্ন একটা ফার্মেসিতে রেখেছি। এখানে আমরা একটু শুশ্রূষা করেছি। তাকে এক্ষুণি ঢাকায় কোনো বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সে অস্ফুট স্বরে আমাদেরকে বলছে– জিএম স্যারকে একটু জানান। এর বেশি কিছু বলতে পারছে না। এছাড়া তার সঙ্গে থাকা আইডি কার্ড দেখে বুঝতে পারছি যে সে আপনাদের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন।

মাত্র ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে গোসল সেরে রাতের খাবার খেতে বসবেন– তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। জিএম আকবরের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে। তিনি ভাবতে থাকেন, তার ফ্যাক্টরির একজন স্টাফের এ দূরাবস্থা। কেউ তাকে মেরেছে। অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার পাশ থেকে কুড়িয়ে একটা ঔষধের দোকানে নিয়ে স্থানীয় লোকজন শুশ্রূষা করেছে। অবস্থা কতটা গুরুতর তা আন্দাজ করা কঠিন। আমরা এখন কি করব? পরামর্শ চেয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে হবে। বাঁচা-মরার ব্যাপার। অপর পাশ থেকে টেলিফোন করা লোকটি অপরিচিত হলেও সম্মানজনকভাবে আকবরকে স্যার সম্বোধন করে কথা বলছিল। আকবর সাহেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, তিনি কি বলবেন। আহত আসলামের কী রকম আঘাত লেগেছে, তার শারীরিক অবস্থাই বা কেমন! সে কি সাভার থেকে ঢাকায় একা আসতে পারবে? অনেক শংকা, তাই আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রান্তের অপরিচিত ভদ্রলোককে বললেন– তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে। এতে তিনি রাজি হলেন। তিনি নিজেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন। আহত আসলামকে যত দ্রুত সম্ভব কার্মগেটস্থ আলরাজী হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করলেন।

আকবর নিজেও গোসল, আহার এবং নামাজ শেষ করে নিকটস্থ হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বের হলেন। তারা কোন পর্যন্ত পৌঁছেছেন, তা জানার জন্য ফোনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে চলেছেন। সাভার থেকে আমিন বাজার পর্যন্ত ট্যাক্সি পৌঁছে আর সামনে এগোয় না। প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। এদিকে আসলামের অবস্থাও খারাপ থেকে অধিকতর খারাপের দিকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ট্যাক্সিতেই একবার বমি করেছে। অপেক্ষার পালা কখন শেষ হবে। জিএম আকবর তাঁর ফ্যাক্টরির আরও দুই সহকর্মীকে টেলিফোনে দুঃসংবাদটি জানিয়ে কার্মগেটে আলরাজী হাসপাতালে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তারা আসার পর একত্রে পরামর্শ করে হাসপাতালের রিসিপশনিস্টের কাছে আগাম আহত রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ডাক্তার সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। কিন্তু কর্মরত রিসিপশনিস্ট রোগীর অবস্থা সম্পর্কে স্বশরীরে না দেখে, কিছু না জেনে আগাম কোনো কিছুই বলতে পারলেন না।

এদিকে রাত বাড়ছে। ট্রাফিক জ্যাম অতিক্রম করে আমিন বাজার, গাবতলী, টেকনিক্যাল পার হতে আরও প্রায় ঘন্টাখানেকের উপর লেগে যাবে। আসলামের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। কখনও জ্ঞান ফিরে, আবার মুর্ছা যায়। সঙ্গের যিনি আসলামকে বয়ে নিয়ে আসছেন, তার নাম জানা গেল আলী রিয়াজ। তিনি খুবই ধৈর্য্যের সাথে তাকে নিয়ে আসছেন।

আমিন বাজার পার হতেই রাস্তার উপর টহলরত পুলিশ কনস্টেবল ট্যাক্সির ভিতর সার্চ করতে চাইলেন। আহত রোগী আসলামকে দেখে সন্দেহ হলো তাদের। পুলিশ জিজ্ঞেস করল– উনি কে? উনি আপনার কী হয়? আলী রিয়াজ অবস্থা বুঝে উত্তর দিলো আমার কাজিন হয়। তার অবস্থা গুরুতর। ভালো জরুরি চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পুলিশ সদস্য অনড় অবস্থান নেয়। তাকে ছাড়া যাবে না। নিশ্চয় আপনি তাকে মেরে গুমের উদ্দেশে কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন। কাছেই আমাদের পুলিশ ফাঁড়ি আছে। ওখানে চলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে বিনয়ের সাথে পুলিশকে অনুরোধ করলেন ছেড়ে দেয়ার জন্য। পুলিশ তাদের অপারগতা প্রকাশ করে ট্যাক্সিটিকে সামনে এগুনোর পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন। তখন রিয়াজ জিএম আকবরকে ঘটনাটি ফোনে জানাল। জিএম আকবর পুলিশকে নিজের এবং তার সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে পুলিশকে বুঝাতে সক্ষম হয়। পুলিশও সহজেই ছেড়ে দিতে রাজি হয়। এদিকে রিয়াজকে দুইশত টাকা পুলিশকে দেওয়ার জন্য আকবরকে পরামর্শ দেন। রিয়াজ পুলিশকে দুইশত টাকা ধরিয়ে দেন। সাথে সাথে পুলিশ টাকাটা নিয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয়। এতক্ষণে ট্রাফিক জ্যামও কিছুটা হালকা হয়। ট্যাক্সিটা সামনে চলতে থাকে। কল্যাণপুর পর্যন্ত পৌঁছার পর ট্যাক্সির ড্রাইভার বলে ওঠেন– আমার গাড়ির গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। গ্যাস নিতে হবে। আমি অন্য একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দেই। সেটাতে চলে যান। গ্যাস প্রাপ্তির জন্য দীর্ঘ গাড়ির লাইন। এখান থেকে গ্যাস নিয়ে আবার রওনা হতে দেরি হবে। তাই আহত আসলামকে পাঁজাকোলে করে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে অন্য আর একটা ট্যাক্সিতে ওঠে। রাত তখন প্রায় বারোটা বাজে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেয়। ট্যাক্সির ড্রাইভারটি ভালো লোক ছিলেন। মিটারে যে পরিমান ভাড়া উঠেছে, সেই পরিমান ভাড়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। অতিরিক্ত কোনো ভাড়া চায়নি।

পরের ট্যাক্সিতে করে দ্রুত সময়ের মধ্যে ট্যাক্সিটি ওদের দুজনকে নিয়ে ফার্মগেট আলরাজী হাসপাতালে পৌঁছে যায়। অপেক্ষারত আকবর ও তাঁর সাথে উপস্থিত দুজন সহকর্মী আহত আসলামের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং বুঝার চেষ্টা করেন, তার এ অবস্থায় এ হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব কি না?

একজন রিসিপশনিস্ট কাউন্টার ছেড়ে বাইরে ট্যাক্সির কাছে চলে আসেন এবং রোগীর অবস্থা ট্যাক্সির মধ্যেই পর্যবেক্ষণ করেন, সাথে সাথে বলে দেন, এখানে নয় আপনাদের রোগীকে অন্য কোথাও নিয়ে যান। ঢাকা মেডিক্যালে গেলে ভালো হয়। কালবিলম্ব না করে

ঐ ট্যাক্সিতে করেই ঢাকা মেডিক্যালের দিকে রওয়ানা হন। অন্য দুই সহকর্মী অন্য আর একটি ট্যাক্সি নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করে।

রাত প্রায় একটা। ঢাকা মেডিক্যালের গেট পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে ট্যাক্সি দুটো। আহত আসলামের নামে টিকিট নিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করে। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে গভীর রাতেও অনেক রকমের লোকের ভীড়। এম মধ্যে দালাল প্রকৃতির লোকও আছে। এরা ওয়ার্ডে নতুন রোগী ধরার জন্য ওত পেতে থাকে এবং সুযোগ বুঝে শিকার ধরে। হাসপাতালে রোগী প্রচুর। সে তুলনায় ব্যবস্থা অপ্রতুল। তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু কর্মী আছে যারা সেবার নামে অর্থ আদায়ে নানা ফন্দি আঁটে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার কথা। কিন্তু না, ডাক্তারের দেয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ, রক্ত, ব্যান্ডেজ এমনকি এক্স-রে পর্যন্ত বাহির থেকে করতে হচ্ছে। কোনো সিট মেলেনি। সিঁড়ি বারান্দায় গুরুতর আহত আসলামকে রাখতে হয়েছে। তবে, সদ্য পরিচিত দালাল সুরুজ অনেকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। শুধু তার জন্যই চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্রুত নেয়া গেছে। একটু আগে ডাক্তার রোগীকে দেখে গেছেন। প্রেসক্রিপশনও দিয়েছেন সাথে সাথে একটা ইনজেকশনও পুশ করিয়েছেন এবং খাওয়ার ঔষধের ব্যবস্থা দিয়েছেন। বললেন- চিন্তার কোনো কারণ নাই। এক্স-রের রিপোর্ট পেলে, কাল সকালে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইনজেকশন দেয়ার পর আসলাম ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে আর কোনো অসুবিধা হয়নি। সাভার থেকে আগত আলী রিয়াজও অন্য সবার সাথে হাসপাতালেই রাত কাটিয়েছেন। তার আন্তরিক সহযোগিতা এবং ব্যবহারে আকবর মুগ্ধ হয়েছেন। একইভাবে দালাল সুরুজও নিকট আত্মীয়ের মতো আসলামের দেখভাল করতে থাকেন। আসলাম ঘুমুচ্ছে। সুরুজ তাকে হাত পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছে। পুরণো বালিশ এবং পত্রিকার কাগজ বিছিয়ে আসলামকে শুইয়ে দিয়েছে। অন্যদেরকেও বসার সুযোগ করে দিয়েছে। রোগী এবং অন্যান্য লোকদের ভীড়ে কোলাহলপূর্ণ হাসপাতালটিতে ভোরের দিকে এক ধরনের নিরবতা নেমে আসে। দূর থেকে ভেসে আসে আযানের ধ্বনি। ভোরের পূর্বাভাস।

আলো ফুটে উঠেছে। সকলের মাঝে কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেছে। আসলামও অস্ফুট স্বরে কথা বলতে চাচ্ছে। আসলাম হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। আকবরকে দেখে বলে ওঠে– স্যার, আপনি আমাকে বাঁচান। সান্ত্বনার স্বরে আকবর বলেন– চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি ভালো হয়ে যাবেন। একটু পর ডাক্তার আসবেন।

সকাল আটটার দিকে একজন বিশেষজ্ঞ ভিজিটর ডাক্তার ঐ ওয়ার্ডে আসলেন। আসলামকে দেখে তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং জানালেন ছোট্ট একটা অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেভাবেই সব রকমের প্রস্তুতি নেয়া হলো।

এতক্ষণে আসলামকে সাভার থেকে নিয়ে আসা আলী রিয়াজ আকবরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে চাইলেন। আকবর তার কর্তব্যকর্মের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। ঢাকায় আসার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলী রিয়াজের নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে আসলামকে চরম ঝুঁকি নিয়ে আসতে হয়েছে। তাই আলী রিয়াজকে খরচের টাকাগুলো হিসাব করে ফেরত দিতে চাইলেন। কিন্তু আলী রিয়াজ টাকাগুলো নিতে চাইলেন না। বিস্ময়ে আকবর আলী রিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আলী রিয়াজ বলতে লাগলেন– আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গতরাতে টিউশনি করে হলের দিকে ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আসলামের এ দুরাবস্থা দেখে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় ফার্মেসিতে রেখে চলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার সাথে থাকা আইডি কার্ডে আপনাদের সুপ্রতিষ্ঠিত পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দেখে আমার দায় বোধ থেকে আমি তাকে এখানে নিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমার এসএসসি পাশের পর উচ্চশিক্ষা চালানোর মতো আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না, কিন্তু আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমি শুধু আমার কর্তব্যটুকুই পালন করেছি। এর বেশি কিছু নয়। টাকা দিয়ে কিংবা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে ছোট করবেন না। তার টেলিফোন নাম্বার, নাম, ঠিকানা রেখে আকবর তাকে বিদায় দিলেন।

সফল অস্ত্রোপচারে আহত আসলামের অবস্থা আর একটু ভালো হয়েছে। আজকেই হাসপাতাল থেকে তাকে ডিসচার্জ করা হবে। দালাল সুরুজ আসলামের ডিসচার্জের ব্যাপারে সবরকম ফলোআপ করেছে। এবার হাসপাতাল থেকে বিদায়ের পালা। জিএম আকবর আবার হাসপাতালে আসলেন এবং আসলামকে সাথে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এবার সুরুজের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। সুরুজকে তার প্রাপ্য যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে চাইলেন আকবর। কিন্তু অবাক কাণ্ড! সুরুজ কোনো টাকা-পয়সা নিতে চাইল না। শুধু বলল– আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। আমি মাঝে মাঝেই হাসপাতালে আসি এবং অসহায়, গরীব দুখি রোগীদের সেবা করি। প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা করে থাকি। এটা আমার কোনো পেশা নয়। এখানে মানুষ বিপদে পড়ে আসে। এদের উপকার করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। আপনারা আসুন। পাঠক, সুরুজকে এতক্ষণ আপনাদের দালাল বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তার কর্তব্য এবং কাণ্ড দেখে অবাক হলেন আকবর। সে সত্যিই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিবেদিত প্রাণ পরোপকারী মানুষ। তার তুলনা সে একমাত্র নিজেই।

# বিশুদ্ধ ভালোবাসা

মাহমুদুল করিম মজুমদার
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
সিটিজেন টেকনোলজি লিমিটেড

১১

ছেলে ঃ বাবা, আমি কি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

বাবা ঃ অবশ্যই। বলো, কী জানতে চাও?

ছেলে ঃ বাবা, তুমি প্রতি ঘন্টায় কত আয় করো?

বাবা ঃ এটা জেনে তোমার কোনো লাভ নেই। কেন তুমি এটা জিজ্ঞেস করলে?

ছেলে ঃ আমি শুধু জানতে চাই। দয়া করে বলো না, তুমি প্রতি ঘন্টায় কত করে আয় করো?

বাবা ঃ জানতে চাওয়াটা যদি খুব জরুরি হয় তাহলে শোনো, আমি প্রতি ঘন্টায় এক হাজার টাকা আয় করি।

ছেলে ঃ ওহ! (নিচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে)। আমি কি তোমার কাছ থেকে পাঁচশত টাকা পেতে পারি?

বাবা ঃ (অগ্নিমূর্তি ধারণ করে) যদি এই একটাই কারণ হয়ে থাকে যে তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা দিয়ে উল্টাপাল্টা খেলনা অথবা অন্য কোনো অর্থহীন জিনিস কিনবে, তাহলে তুমি সোজা তোমার রুমে চলে যাও এবং বিছানায় শুয়ে পড়ো। ভাবো, কেন তুমি এতটা স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছ। আমি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি তোমার এইসব শিশুসুলভ আচরণের জন্য?

ছেলেটি শান্তভাবে সোজা তার রুমে চলে গেল এবং দরজা বন্ধ করে দিলো। বাবা বসে পড়লেন এবং ছেলের প্রশ্নের কথা ভেবে আরো রাগান্বিত হলেন। কিছু টাকার জন্য সে কীভাবে এই ধরনের প্রশ্ন করল? একঘন্টা বা তারও চেয়ে বেশি পরে ছেলেটির বাবা শান্ত হলেন এবং ভাবতে লাগলেন, হয়তো এমন কিছু তার ছেলের খুব জরুরি দরকার যার জন্য সে পাঁচশত টাকা চেয়েছে। সে তো সচরাচর টাকা চায় না। তিনি ছেলের রুমের দরজার দিকে গেলেন এবং দরজা খুললেন।

বাবা ঃ তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ, বাবা?

ছেলে ঃ না বাবা, আমি জেগে আছি।

বাবা ঃ আমি ভাবছিলাম, হয়তোবা আমি তোমার সাথে অনেক বেশি মেজাজ দেখিয়েছি। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে ছিলাম আর সেই রাগটা তোমার উপর ঝেড়ে দিলাম। এই নাও পাঁচশত টাকা, যেটা তুমি চেয়েছিলে।

ছেলেটি এক লাফে বসে পড়ল এবং হেসে দিলো। তারপর বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বাবা। অতঃপর সে তার বালিশের নিচ থেকে কিছু ভাঁজ করা নোট বের করল। বাবা দেখলেন তার ছেলের কাছে টাকা থাকা সত্বেও সে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। এটা দেখে তিনি আবার রাগতে শুরু করলেন। ছোট ছেলেটি আস্তে আস্তে তার টাকাগুলো গুনল এবং তার বাবার দিকে তাকাল।

বাবা ঃ তোমার কাছে টাকা থাকা সত্বেও কেন তুমি আবার আমার কাছে টাকা চেয়েছ?
ছেলে ঃ কারণ আমার কাছে যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু এখন হয়েছে। বাবা, আমার কাছে এখন এক হাজার টাকা আছে। আমি কি তোমার সময় থেকে এক ঘন্টা কিনতে পারি? প্লিজ, আগামিকাল তাড়াতাড়ি এসো। তোমার সাথে ডিনার করব।

ছেলেটির বাবা কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। তিনি বসে পড়লেন এবং তার ছেলের কাঁধে হাত রাখলেন। তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। এই ঘটনাটি আমরা যারা জীবনে অনেক বেশি ব্যস্ত তাদের একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই বলা। সময় যেন আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে না যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। আমাদের উচিত কিছু সময় তাদের সাথে ব্যয় করা, যারা আমাদের কথা সব সময় ভাবে, যারা আমাদের আত্মার আত্মীয়। যদি আমরা আগামিকাল মারা যাই, তাহলে যে কোম্পানির জন্য আমরা কাজ করি তারা অনায়াসেই আমাদের জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে নিবে। কিন্তু যে পরিবার এবং বন্ধু আমরা রেখে যাবো তারা আজীবন আমাদের অভাব বোধ করবে। তাই শত কাজের পাশাপাশি আমরা যেন আমাদের পরিবারকেও সময় দেই।

কিছু কিছু ব্যাপার অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
(অনুবাদ)

# চায়না ভাষা শেখার ইতিবৃত্ত

মুহাম্মদ সাইফুল হক
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

ব্যাবিলন কথকতায় লেখা দেয়ার জন্য সহ-সম্পাদক মাহমুদের একটা চাপ থাকেই যদিও আমি নিজেও লেখা দিতে সর্বদা স্বতঃপ্রণোদিত। অনিয়মিত ও অপেশাদার লেখকদের একটা বড় সমস্যা হলো লিখতে মনস্থ করলেও বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তো সমস্যাটা নিয়ে ভুগছিলাম বেশ অনেকদিন থেকেই।

হঠাৎ করেই আজ মাথায় এল আমিতো এবার ব্যাবিলন কথকতায় চায়না ভাষা শেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে পারি। চায়না ভাষা শেখার ইচ্ছে আমার হতো না, যদি ২০০৬ সালের জুন মাসে ভাষাটা না জানার দুর্গতি না পোহাতে হতো। সেই থেকে মনে হয়েছে চীন দেশে যদি আবার আসতে হয় তাহলে কিছু জরুরি প্রয়োজনীয় ভাষা শিখতেই হবে।

যাহোক, বেশ কিছুদিন আর এই প্রয়োজনটা বোধ হয়নি চায়না আসার সুযোগ না ঘটার কারণে। দ্বিতীয় সুযোগটা এল প্রায় ছয় বছর পর অর্থাৎ ২০১২ সালের ডিসেম্বরে। আগের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে সে বছর নভেম্বরেই ভর্তি হয়ে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে। অফিস শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভিনিং ক্লাস করাটা বেশ কঠিনই ছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বেশ ভালো লাগছিল প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে। সেই পুরণো অভ্যাস– ক্লাস বিরতিতে রাস্তার পাশের দোকানে চা খাওয়া, আড্ডা দেয়া, গল্প করা ইত্যাদি। তবে প্রায়শই দেরি হতো ক্লাসে পৌঁছতে। অফিস শেষে জ্যাম পার করে ক্যাম্পাসে যেতে বেশ বেগ পেতে হতো। যাহোক, মাত্র চারটি ক্লাস করেই চলে যেতে হলো হংকং ও চায়নায় অফিস ট্যুরে। তখন থেকেই একটু একটু বলার চেষ্টা তবে তা কেবলমাত্র একটি/ দুটি শব্দ বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাতেই চায়নিজ বন্ধুরা যেভাবে উৎসাহিত করছিল ও শিখিয়ে দিচ্ছিল তাতে খুব ভালো লেগেছিল। এরপর দেশে ফিরে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে শত প্রতিকূলতা সত্বেও অংশ নিয়েছি। দেশে ফিরে ক্লাসে এসে দেখি বাংলাদেশি শিক্ষক অধ্যাপক আফজাল হোসেন এর পরিবর্তে ক্লাস নিচ্ছেন চায়নিজ শিক্ষক মিস নান। আমি চায়না সফরের কারণে বেশ কিছু ক্লাস মিস করেছি বলাতে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাকে শেখানোর চেষ্টা করলেন। উপরন্ত আশ্বস্ত করলেন– তিনি আমাকে কিছু লেসন এর কপি সরবরাহ করবেন। তিনি কথা রেখেছেন। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে ঋণী কেননা তার সেই লেসনগুলো আজও আমার উপকারে আসে। বেশ কিছুদিন পর ক্লাসে এসে লক্ষ্য করলাম- অনেকগুলো ছাত্র ঝরে পড়েছে। তবে যারা নিয়মিত ক্লাস করেছেন তাদের বেশ উন্নতি লক্ষ্য করলাম। তাদের মধ্যে তানভীর, বাদল ভাই, মাসুদ ভাই এবং শারাবান তহুরা অমি। আমি এদের

সাথে একটু মিশে ও কথা বলে নিজেকে ছিটকে পড়া থেকে কোনোরকমে প্রতিরোধ করলাম। তানভীর সবচেয়ে ভালো করেছে। স্কলারশীপ নিয়ে প্রথমে বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষার অধিকতর কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে সাংহাইতে এমবিএ করছে। আমার পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক কোর্সটি করার পর আর তা চলমান রাখা সম্ভব হয়নি। যদিও আমার কোর্সমেটদের অনেকেই এডভান্স কোর্সে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ক্লাস করে যাচ্ছিল। তিন মাসের অতিরিক্ত চাপে ক্লান্ত হয়ে প্রায় বছরখানেক বিশ্রাম নিয়ে লক্ষ্য করলাম যা শিখেছি তা প্রায় সবই ভুলে বসে আছি। বেশ লজ্জাবোধ হচ্ছিল সব ভুলে বসার জন্য।

হঠাৎ একদিন পত্রিকার পাতায় একটি বিজ্ঞাপন দেখে আবারো বেশ অনুপ্রাণিত হলাম। বিইউপি (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় যার ক্যাম্পাস মিরপুরে, সেখানে চায়না ভাষার সার্টিফিকেট কোর্স চালু হবে। এরকমই একটি কোর্স আমি করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার ঘরের কাছে শেখার সুযোগ পেয়ে কালবিলম্ব না করে ফরম এনে ভর্তি হয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে তিন মাসের কোর্স এর প্রথম ক্লাস শুরু হলো ২০১৪ সালের ২রা মার্চ। অতগুলো সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের সাথে কোর্স করতে ভালোই লাগল। অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম ক্লাসের শুরুর দিন থেকেই কুইক লার্নার হিসেবে। কাউকে তো আর বলতে যাইনি আমি আসলে ভুলে যাওয়া সম্পদ পুণরুদ্ধার করছি মাত্র। যাহোক, বেশ কজন বন্ধুও জুটে গেল কোর্স চলাকালীন সময়ে এবং বেশ সফলতার সাথেই কোর্স সমাপ্ত হলো যথাসময়ে। এরপর আর কোনো অধিকতর কোর্স করতে না পারলেও নিজস্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় আজ আমি চীনা নাগরিকদের সাথে বেশ আলাপ জমাতে পারি। এখন অন্তত প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে দুচারজন চীনা নাগরিকের সাথে কথা হয়। আমার সহকর্মীদের মধ্যে বেশ কজনকে লক্ষ্য করলাম চাইনিজ ভাষা শিখতে আগ্রহী। তবে মনে হয় তাদের অনেকেই কষ্ট করার দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেনি। ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজন মানসিক দৃঢ়তা ও নিরন্তর প্রচেষ্টা। এটা একটা সময়সাপেক্ষ বিষয়। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সময়ের সাথে সাথে হয়তো ভাষার উপর দক্ষতা বাড়তে থাকে যদি নিয়মিত চর্চা করা যায়। কিন্তু এটার চূড়ান্ত সফলতা কেবল নিরন্তর চেষ্টা ও চর্চার মধ্যেই। আমার এই কথায় কেউ হয়তো আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন, তাদের জন্য বলছি একটি নির্দিষ্ট সময়ের চর্চায় হয়তো ভাষা যোগাযোগের যোগ্যতা অর্জন করা যাবে, কিন্তু দক্ষতার কোনো শেষ নেই। আমি লক্ষ্য করেছি আমার ভাষা বলার সামান্য দক্ষতাতেই অনেকে অভিভূত হন তা সে চৈনিক বা অচৈনিক মানুষই হোন না কেন। কিন্তু আমি জানি পুরো ভাষার আমি খুব সামান্যই আয়ত্তে আনতে পেরেছি। তবে যতটুকু পারি তা সম্ভব হয়েছে আমার অপচয়যোগ্য সময়টার খুব সামান্য অপচয় ঠেকিয়েই। তৃতীয়বারের মতো ২০১৫ সালের জুন মাসে আমি হংকং ও চায়না সফরে গিয়ে নিজের শেখা ভাষার ব্যবহারিক পরীক্ষা দিয়ে বুঝতে পারি আমার শেখা সঠিকপথেই চলছে। সেই সফর থেকে ফিরে এসে চায়না ভাষা শেখার স্পৃহা আরো বেড়ে যায়।

প্রতিদিন আমরা টিভি দেখে; অহেতুক আলাপচারিতা ও উদ্দেশ্যহীনভাবে চলে অনেক সময় নষ্ট করি। আমি চেষ্টা করেছি ব্যক্তিগত সময়ের এই অপচয় রোধ করে তা ভাষা শেখার কাজে ব্যবহার করতে। আজ আমার চায়না ভাষার শেখার যতটুকু দখল তা কেবল গত দেড় বছরের ব্যক্তিগত কাজে প্রাপ্য সময়ের কিছুটা অপচয় রোধের ফসল। আমি মনে করি আমরা প্রত্যেকেই সৃষ্টিকর্তার দেয়া সুস্থতা ও সময়ের যদি একটি হিসেব করে কাজে লাগাই তবে তা থেকে অনেক অর্জন সম্ভব। এই যেমন আমি আমার সময়ের সামান্য অপচয় রোধ করে পাচ্ছি বন্ধু, সহকর্মীদের শ্রদ্ধা। চীনা ভাষার নাগরিকদের অতিরিক্ত খাতির ও অপরিচিত মানুষদের অবাক বিস্মিত সমীহপূর্ণ দৃষ্টি। আমি মনে করি প্রতিদিনের অপচয়কৃত সময়টার যত বেশি সৃজনশীল ব্যবহার বাংলাদেশের মানুষ করবে তত উৎপাদনশীল জাতিতে পরিণত হতে পারব আমরা। নিজের শখগুলো আবিস্কার করে তার পেছনে সামান্য প্রচেষ্টা যোগ করলেই সম্ভব অভাবনীয় সব অর্জন। তবে এর জন্য প্রয়োজন নিজের মধ্যেই প্রেরণা সৃষ্টি করা। কারণ বাংলাদেশের খুব কম মানুষ ভালো কাজের অনুপ্রেরণা ও খারাপ কাজে নিরুৎসাহ প্রদানের চারিত্রিক সামর্থ অর্জন করতে পেরেছে। অথচ অনেককেই পাওয়া যাবে ভালো কাজেও নিরুৎসাহ প্রদান করতে। এইতো সেদিন আমি আমার একজন সিনিয়র সহকর্মীর কাছে জানতে পারলাম– কেউ কেউ নাকি সন্দেহ প্রকাশ করেছে আমার এই চায়না বলার চেষ্টা ও চর্চার কারণ চায়না ভাষাভাষীদের কাছে কোনো অনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা কি না! আমি শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারিনি। কেবল অনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য কষ্টকর একটি কঠিন ভাষা শেখার প্রয়োজন আছে কি? এতে আমার ভেতরটা মর্মাহত হয়েছে। একটু থমকে গিয়েছি কিছুক্ষণের জন্যও। আবার নিজেকে সামলে নিয়েছি, এগিয়ে চলেছি। আমি মনে করি যেকোনো সৃজনশীল কাজেই এরকম কিছু বাঁধা থাকে এবং তাতে থমকে গেলে চলবে না।

২০১৬ সালের মার্চের শেষে তিনদিনের সফরে চায়না গিয়ে গাড়িতে, ট্রেনে, দোকানে, রেস্টুরেন্টে, হোটেলে, পথে-ঘাটে সর্বত্রই চেষ্টা করেছি শেখা ভাষার ব্যবহার করতে। তাতে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। তাইতো এখন কেবল এগিয়ে চলার প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে বাইরে যাওয়ার প্লান না থাকলে একাকী ভাষা চর্চা কখনও কখনও যে পরিবারকে মনঃক্ষুণ্ন করেনি তা কিন্তু নয়। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে তাদের মেনে নেয়ার মানসিকতা ও সহযোগিতা আমার ভাষার দখলে ভূমিকা রেখেছে। আমার কন্যাদ্বয় কখনও কখনও আমার চায়না ভাষা অনুশীলনে যোগানদার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। আজকের এই লেখাটির উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নিজের চীনা ভাষা শেখার খবরটি সকলকে জানিয়ে দেয়া, কিংবা বাহবা কুড়ানো বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, চাইলে নিজের অপচয়যোগ্য সময়কে ব্যবহার করেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক অর্জনই সম্ভব। আসুন, আমরা অপচয়যোগ্য সময় কমিয়ে ফেলি এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর ব্যক্তিগত শখগুলোর পরিচর্যা করি।

# পারমিতা!

ইথার আক্তারুজ্জামান
প্রাক্তন জুনিয়র অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

কে যেন কবে!
হঠাৎ ভুল করে বেভুল সুরে ডাকে
শূন্যতার শৃঙ্খলিত কোলাহল ধরে,
নিথর নষ্ট নিষ্পলক নক্ষত্রের অন্তরালে!!

তার কথা বলব কি আর!
সে তো বহুকাল আগেই গিয়েছে হারিয়ে,
অবাধ্য অগ্রহণের আঁধারের এপিটাফ অক্ষরে,
ভুল ইশারার মৌন নীলের অনাকাঙ্খিত উৎসবে!!

এখানে অবশিষ্ট কেবল,
সময়ের সিথানে সুস্মিতা স্মৃতির সাদা সাদা সোহাগ,
অনুচ্চারিত অতন্দ্র স্থবির আর্তনাদ!

পারমিতা!
তোমায় ছুঁয়ে!
করেছি পাপ!
আমি অবিনাশী অভিশাপ।

# টাকা

মোঃ জাকারিয়া হোসেন
সিকিউরিটি গার্ড, সিকিউরিটি সেকশন
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

টাকার জন্য কত মানুষ
ঘুরছে শহর ঢাকা,
তবুও কারো খোলেনাকো
ভাগ্য নামের চাকা।

খুন-হত্যা-রাহাজানি
টাকাই হলো কারণ,
টাকার জন্যই তুচ্ছ ভীষণ
মানুষের এই জীবন।

টাকার জন্য কত মানুষ
পশু হয়ে যায়,
এ জীবনে শুধু টাকা
আর কিছু না চায়।

যতই করো কামাই তুমি
যতই বানাও টাকা,
মৃত্যুর পরে কিছু যাবে না
পকেট থাকবে ফাঁকা।

# সুঁচ-সুতা

মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম (রিসাদ)
অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটর, সুইং
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

চোখ ভরা উদ্ভাসিত স্বপ্ন
উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ হবে কি?
ব্যাবিলন ভারি প্রিয় নাম
যেথায় হয়েছে মোদের কর্মসংস্থান।

কোরআনের বাণীতে শুভসূচনা
খুশিতে ভরে উঠে হৃদয়খানা,
গানের সুরে কাটছে মোদের
সুখ মাখানো কর্মঘন্টা।

কর্মই যদি তাজ হয়
লাজ তবে নিশ্চয়ই অলসতায়,
সুঁচের ফোড়ে স্বপ্ন এঁকেছি
সুতা মোদের নিয়তির চাবি।

সদা থাকি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন
নিজেই ডাক্তার– অসুখের হার,
মনটা থাকে প্রশান্তিতে ভরা
কাজে হব আমরাই সেরা।

কাজের ভুলে স্যারের বকুনি
অভিজ্ঞতা বাড়ানোর মন্ত্র মানি,
ভালো কাজে সবার খুশি
এই হোক মোদের প্রতিশ্রুতি।

মন্দ কাজে মেলে হতাশা
ভালো কাজে পাই বাহবা,
পদোন্নতি যদি পেতে চাও
অর্জিত শক্তি দেখিয়ে দাও।

নিজের কাজ করলে ভালো
সবার কাজ সহজ হলো,
মোরা করব না আর হেলাফেলা
হই সচেতন কাজের বেলা।

অন্যায় অনিয়ম করব না
কোনো বিপদে পড়ব না,
আপন সফলতায় শীর্ষে যাবো
স্বপ্ন মোদের পূর্ণ হবে।

রয়েছে ফ্রি পরিবহন সেবা
স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত রাত্রি-দিবা,
অর্ধেক মূল্যে খাবার পাই
অসীম দয়ার তুলনা নাই।

যদি হই কর্মে বিশ্বাসী
সবার মুখে ফুটবে হাসি,
স্বপ্ন পূরণ হবে নিশ্চয়
ব্যাবিলন পাশে– হতাশা নয়।

# শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে?

রতন চন্দ্র রায়
জুনিয়র অফিসার, বিলিং সেকশন
বাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু
হলো আমার বই,
বইয়ের সাথে নিত্য আমি
মনের কথা কই।

মানুষ বন্ধু ঝগড়া বাধায়
বন্ধ করে কথা,
বই বন্ধু তা করে না
দেয় না মনে ব্যথা।

যত বন্ধু দেখি আমার
বইয়ের মতো নয়,
বই-ই আমার জীবনটাকে
করেছে স্বপ্নময়?

আমার কোনো বিপদ হলে
পালায় না সে ছেড়ে,
বুদ্ধি দিয়ে হাতটি বাড়ায়
যতটুকু সে পারে।

এসব কথা ভেবে আমি
এই করেছি পণ,
বইয়ের সাথেই বন্ধুত্ব
রাখব সারাজীবন।

# বালকবেলা

মৌমিতা
সিনিয়র অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

শহর থেকে দূরে বহু দূরে-
পাখিরা সব উড়ে উড়ে
খাচ্ছে দোলা গাইছে গান,
সে গ্রামটি আমার জন্মস্থান।

নদীরা মিশেছে নদীর সাথে
রোদেরা খেলছে খেলা,
যেখানে কেটেছে স্মৃতিমধুর
আমার বালকবেলা।

রাতের আঁধারে জোনাকির আলো
তারার ঝিকিমিকি,
উঠোনে শুয়ে স্বপ্ন বুনন
জীবনের কথা লিখি।

সেখানে মায়ের স্নেহের পরশ
দাদির মমতা,
যেখানে কেটেছে মধুকাল আহা
বাল্য চপলতা।

# অদৃষ্ট

মৌসুমী
জেনারেল অপারেটর, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

১১

আমি মৌসুমী। ঠাকুরগাঁও জেলার নেকমরদ গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের একমাত্র সন্তান। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই মায়ের গর্ভে বসে যখন সেই আলোর অপেক্ষায় দিন গুনছি, তখনই আমার জন্মদাতা মারা যান। বাবা বলে ডাকার কেউ থাকল না। একরাশ কষ্ট নিয়ে পৃথিবীতে এলাম। স্বামীহারা আমার দুখিনী মাকে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখালেন আমার অসহায় বৃদ্ধ দাদা-দাদি। কম বয়সে স্বামীহারা হতভাগিনী মাকে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে। কতদিন যে না খেয়ে দিন কাটিয়েছেন তা জানেন আমার দাদা-দাদি আর সৃষ্টিকর্তা। অল্প বয়সে স্বামী মারা যাওয়ায় গ্রামের মানুষরা মাকে অনেক কথা শুনাতো। আর গর্ভে থাকতে বাবা মরে যাওয়ায় সবাই আমাকে অলক্ষুণে, অপয়া বলে গালমন্দ করত। অনাহার, অপমান, দারিদ্র এই সবকিছু সহ্য করতে না পেরে একদিন সবাইকে ছেড়ে বাবার কাছে চলে যান আমার মা। এই হলো আমার অদৃষ্টের সূচনা।

এতিম আমার দায়ভার গ্রহণ করেন আমার বৃদ্ধ দাদা-দাদি। পরের জমিতে কৃষিকাজ করে, এটা-ওটা করে দাদা-দাদি দুজনেই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন আমাকে মানুষ করার চেষ্টা করতে থাকেন। ছোটবেলা থেকে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে দাদা আমাকে কষ্ট করে লেখাপড়া করাতে থাকেন। অনেক কষ্ট এবং আমার চেষ্টায় এসএসসি পর্যন্ত পড়াশুনা করলাম। এরই মাঝে দাদা-দাদির সাথে বিভিন্ন সময় কৃষিকাজ, দিনমজুরি এবং মানুষের বাড়িতে কাজ করতে থাকি। আমাদের গ্রামের বেশিরভাগ ঘরগুলোই মাটির। অনেক দূর থেকে মাটি নিয়ে এসে মানুষের ঘর লেপে দিতাম, ধান শুকিয়ে দিতাম রোদে পুড়ে। তারপর তাদের দেয়া ধান বা টাকা দিয়ে নোট বই কিনতাম। পড়াশুনা করা হলো না আমার। রেজিস্ট্রেশন করার টাকা জোগাড় করা হয়নি। দাদা-দাদি খুব কেঁদেছিলেন আমার লেখাপড়া হয়নি বলে। আমি মেনে নিলাম অদৃষ্টকে। একদিন গ্রামের এক বড় বোন দাদা-দাদিকে বলেন- মেয়েটাকে এত কষ্ট না দিয়ে আমার সাথে শহরে পাঠান। আমি যেখানে চাকরি করি সেই ফ্যাক্টরিতে ওকে চাকরি দিয়ে দিই। ভালোই থাকবে। প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। দাদা-দাদিকে বুঝিয়ে বলি- এখানে এত কষ্টের চেয়ে গিয়ে একবার দেখিই না, ভালো

না হলে না হয় চলে আসব। দাদা-দাদি খুব একটা সাড়া দিলেন না। বিভিন্ন কথা ভাবতে লাগলেন। মানুষ কী ভাববে, অবিবাহিত এত বড় একটা মেয়ে শহরে একা একা কোথায় থাকবে, কী করবে ইত্যাদি। যাইহোক, অবশেষে তাদের রাজি করিয়ে চলে আসি ঢাকায়। শুরু করলাম অদৃষ্টকে বদলানোর লড়াই। অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটর হিসেবে চাকরি নেই ব্যাবিলনে। নিজের খাওয়া, বাড়িভাড়া, খরচের টাকা রেখে মাসে মাসে দাদা-দাদির জন্য বাড়িতে টাকা পাঠাতে থাকি। এভাবে পার হয় দুই এক বছর।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে দেখি আমার দাদা খুব অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। কথাও বলতে পারেন না ঠিকমতো। দাদিও খুব ভেঙে পড়েছেন। আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনতো এই দুটি মানুষ। এদের কিছু হলে কি হবে আমার? কোথায় যাবো আমি? ভেতর থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছি, যেন শরীরে একবিন্দু শক্তি নাই। প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকি এদের অবলম্বন হওয়ার। যাইহোক, আল্লাহতায়ালা সহায় হলেন। দাদা কিছুটা সুস্থ হলেন। একদিন কাছে বসিয়ে, পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে দাদা বললেন- বোনরে, আমরা তো আর বেশিদিন বাঁচব না, কষ্ট করে তোকে বড় করেছি– তোর সুখ দেখে যেতে চাই। তোকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে মরেও শান্তি পেতাম। মাথা নিচু করে কথাগুলো শুনতে লাগলাম, মুখে বললাম না কিছুই। ভাবলাম হয়তো এটাই অদৃষ্ট। একদিন আমার আপন খালা এলেন বাড়িতে। দাদা-দাদিকে বললেন, আমার বোনের মেয়েটার জন্য তো কোনোদিন কিছু করতে পারি নাই। আমি আমার ছেলের সাথে ওর বিয়ে দিয়ে ওকে আমার কাছে রাখতে চাই আমার মেয়ের মতো করে। প্রস্তাবে রাজি হন আমার দাদা-দাদি। খালাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়ে যায় আমার। ভাবলাম অদৃষ্ট বুঝি খুলেছে। কিন্তু আমি কীভাবে জানব, আমাকে ছেলের বউ করে ঘরে আনার পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য একটি অসহায় মেয়েকে আশ্রয় দেয়া নয়, আমার দাদা-দাদির একমাত্র বসতভিটাটুকু, যা দাদা-দাদি আমার নামে লিখে দিয়েছেন সেটিই প্রধান উদ্দেশ্য।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে আমাকে। বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতে থাকে। ঘরে ভাত থাকা সত্বেও সারাদিন কাজকর্ম শেষে একমুঠো ভাত খেতে দেয়া হয়নি আমাকে। আমি তাদের কী করে বুঝাই আমার দাদা-দাদির কিছু নাই তাদেরকে দেয়ার মতো। আর ঐ ভিটে বাড়ি বিক্রি করে দিলে এই বৃদ্ধ মানুষ দুটো থাকবে কোথায়। অনেক ভেবে দেখলাম এইভাবে আর নয়। একদিন শ্বশুরবাড়ির সবাইকে ডেকে বলি আমি শহরে যাই, চাকরি করি, চাকরি করে আপনাদের যা পাওনা আছে আমি শোধ করে দিব। তারা যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলেন– হ্যা হ্যা তাই যাও। আর যতদিন টাকা শোধ দিতে না পারবা এই বাড়িতে আসবা না।

স্বামীকে নিয়ে চলে এলাম আবারও শহরে। ব্যাবিলন গ্রুপের অবনী ফ্যাশন্সে চাকরি নিই।

বছরখানেকের মধ্যেই অপারেটর হয়ে যাই। এরই মধ্যে গর্ভে আসে আমার নতুন অদৃষ্ট, আমার সন্তান। কোম্পানি থেকে এই সময় অনেক সুবিধা পাই। আমাকে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ দিতেন না। প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার ম্যাডামরা চেক করতেন। ওয়েলফেয়ার ম্যাডামরা খোঁজ খবর নিতেন, পাঁচটায় ছুটি দিয়ে দিতেন। এখান থেকেই চার মাসের মাতৃকালীন ছুটি পাই এবং সাথে ছুটির টাকাও। ছুটি শেষে আবার ফিরে আসি। আমার কোল আলো করে পৃথিবীতে আসে আমার ছেলেটি, আমার সবকিছু। ওর বাবা কোনো কাজ করে না। ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে জুগালির কাজ করে, নইলে না। প্রত্যেক মাসে যা বেতন পাই দাদা-দাদির জন্য পাঠাই। যৌতুকের টাকা পরিশোধ করি আর এখানে আমার সংসার খরচ। ছেলের ভবিষ্যৎ জানি না। ওয়েলফেয়ার ম্যাডামরা ব্যাংকে একটা একাউন্ট খুলে দিয়েছেন। বিজিএমইএ থেকে দুই-তিন মাস পর পর টাকা দেয় আমার ছেলের দুধের খরচ বাবদ। আমি এমনই মা, দুধ খাওয়া অবুঝ ছেলেটিকে বৃদ্ধ দাদা-দাদির কাছে ফেলে এসেছি। কোম্পানিতে বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা আছে কিন্তু দাদা-দাদি রাখতে দেন না। এই অল্প বয়সে জীবনের মানেটাকে এত বেশি উপলব্ধি করতে পারছি যে, আমি চাই না আমার ছেলেটার জীবনটাও আমার মতো হোক। বুকের মানিকটাকে বুকে নিয়ে মন ভরে আদরও করতে পারি না। আমার ছেলেটি হাঁটতে শিখেছে, মা বলে ডাকতে শিখেছে। ইচ্ছে করে সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যাই ওর কাছে। বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদি। কিন্তু না, আমি পারি না। যৌতুকের করালগ্রাস থেকে জানি না কবে মুক্তি পাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাদা-দাদি আর ছেলের কাছে চলে যেতে চাই। সেটা কবে? জানি না। শাশুড়ি বলে দিয়েছেন- যতদিন যৌতুক শোধ না হবে শহরেই পড়ে থাকতে হবে।

পারলাম না নিজের হাতে ছেলেটিকে মানুষ করতে। পারলাম না বৃদ্ধ বয়সে দাদা-দাদির সেবা করতে, পারলাম না শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে। সব কষ্ট বুকের ভেতর চাপা দিয়ে জীবন নামক রেলগাড়িতে চলছি... জানি না কোথায় তার শেষ স্টেশন, কোথায় তার গন্তব্য। এতিম, অসহায়, দারিদ্র জর্জরিত যৌতুকের শিকার, শ্বশুরবাড়ির অমানবিক অত্যাচার এই সবকিছুই শুধু একমাত্র আমি মৌসুমীর গল্প নয়- এ আমার মতো হাজারো মৌসুমীর গল্প। যারা হাসতে গেলেও ভাবে, কাঁদতে গেলেও ভাবে। জীবন যেন অর্থহীন, তবুও বাঁচতে হয়। সন্তানের অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সব প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে আশায় বুক বাঁধি প্রতিদিন। হয়তো সুখ আসবে...

# শুনছো, আমরা সেদিন সদলবলে সভা করেছিলাম...

আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
প্রাক্তন ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

১১

২৬ অক্টোবর ২০১২

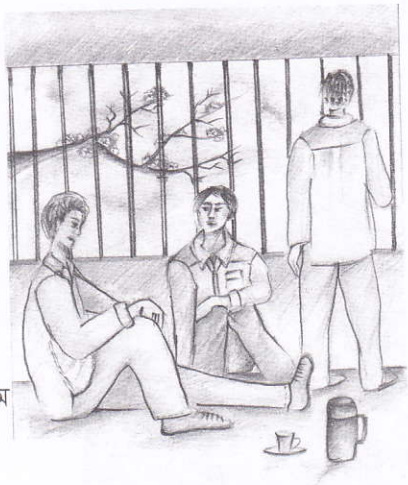

প্রিয় জেসমিন,
আমি জানি যে তোমার সাথে একান্ত খোলামেলা আলাপ হলেই তুমি অনায়াসে আমার অসুখটা ধরে দিতে পারবে। শুনেছি এ জগতের শতকরা আশিভাগ মানুষই মানসিক রোগী। আর আমি জীবনে কখনো সংখ্যালঘুদের দলে ছিলাম না।

আমার নতুন বাসাটা বরাবরের মতো ছয় তলাতেই। বাসার সামনে এক আম গাছ আর এক কিঞ্চিত ব্যস্ত রাস্তা (যে রাস্তা আমাকে নিয়ে দাঁড় করায় হামজা ভাইয়ের বাসার সামনে...) সেই রাস্তার লাগোয়া ফুটপাত আর উপরের আকাশের মাঝে আমার ব্যালকনিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মাহমুদ ভাই, আমি ও হামজা ভাই। হাতে সিগারেট... দরজার ওপাশ থেকে কথক, রাইম ও জুআ-র কোরাস সুর ভেসে আসছে... 'স্মরণের জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে শুধু আমায় ডেকো...' আর দরজার এপাশে আমরা যে যার সামনের দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টি একই দিকে প্রসারিত... কিন্তু মস্তিষ্কের খবর কে বলতে পারে?

'বুক পকেটে জোনাকি পোকা, মনের মাঝে রং
মাথার ভেতর বিক্ষিপ্ততা, উন্মাদনার ঢং'

হঠাৎই মৌনতা ভাঙেন হামজা ভাই, 'আমরা কি বুড়া হয়ে যাচ্ছি রানা?' উত্তরের বাতাস, সিগারেটের ধোঁয়া, গানের কথা আর এই প্রশ্ন... তাল মেলাতে না পেরে প্রশ্বাসে গড়মিল লেগে যায়। অন্য যে কারো কাছ থেকে এই প্রশ্ন এলে আমি কিছুটা হঠকারী উত্তর দিতাম, কিন্তু তিনি হামজা... হামজা আনোয়ার... (ফোনের ওপারে যে মানুষ নেই জেনেও তার ফেলে যাওয়া ফোনে ফোন করতো কথক, বাড়িতে নেই যে মানুষ তা জেনেও তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে বৃন্ত... আর তাই তার সাথে সত্য স্বীকারের কোনো বিকল্প নেই...)

আমি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বলি, 'হ্যা ভাইয়া, আমরা বুড়া হয়ে যাচ্ছি'

আমি বুড়া হয়ে যাচ্ছি...

জানো, সেদিনের আড্ডা মাঝে আমি আমার প্রাণ মেলাতে পারিনি। আমার মাথায় পাকা চুল... আমার মাথার মাঝে ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে...

আর এদিকে হামজা ভাই গেয়ে চলেছেন 'জাতিস্মর'... ভুলে যাওয়া লিরিকে, ভুল করা লিরিকে...
তাল সামলে আচমকা বলে উঠলাম, 'হামজা ভাই, বুড়া হওয়া মানে কি জানেন?'
গিটারের তারে আঙুল ঠেকিয়ে রেখেই তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি...
'বুড়া হওয়া মানে প্রিয় গানের লিরিক ভুল করা, লিরিক ভুলে যাওয়া... বুড়া হওয়া মানে প্রিয় কবিতার লাইন ভুলে যাওয়া...'
ইদানিং হামজা ভুল করেন 'জাতিস্মর'...
কথকের গলায় ওঠে না 'আগুন পাখি'...
বুড়া ভুলে যায় রুদ্রের কবিতা...

জানেন হামজা ভাই, ঐ রাস্তাটা দিয়ে দিনে অন্তত একবার হেঁটে আসি, আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকি দোতলায়, 'একবার, একবার যদি সে দাঁড়ায়...'
কানে ঠেসে রাখা ইয়ারফোনে বেজে চলে সুমনের গান...
জানেন, মাহমুদ ভাইটা এত পাগল, অফিসের কোনো কাজে যদি আমার মন না বসে, বা তার কোনো অনুরোধে যদি আমি তাল না মেলাই,
সে বলে, 'কী, হামজা ভাইকে ডাকব নাকি?'
লোকটা আপনাকে তার একান্ত 'সুমন' বানিয়ে ফেলেছে। ক্রমাগত আবদার তার, কবে আবার জমবে মেলা...

অথচ আমরা বুড়া হয়ে চলেছি।
কথকটাকেতো এখন আর অনুরোধে জল গেলাতেও পারি না, ঢেকিতো বহুদূর...
জানিস কথক, বয়স বাড়ার সাথে অভিমানটাও বাড়ছে সুদের কারবারিদের হিসাব মেনে। এখন আর জোর করতে পারি না। এটাও বুঝি বুড়া হওয়ার লক্ষণ। 'জোর' সে 'শরীরের' কিংবা 'মনের' দু'টাই কমে চলেছে, যেমন কমে চলেছে দৃষ্টি কিংবা স্মৃতির প্রখরতা।
অথচ রাইম ভাইকে দ্যাখ, এখনো সেই রাইম। চারপাশের শত ঝামেলাগুলো কিন্তু তার সেই 'আল রাইম'-কে ছুঁয়ে দিতে পারেনি, কিছুটা সঙ্গ খুঁজে ফেরে কেবল কখনো কখনো...

'রমিজ পাগল মরে যদি লইয়া প্রেমের আঁগ
শেষ বিচারে দেখাইবো বুকের পোড়া দাগ'

শোনো রাইম ভাই, শেষ বিচারে যখন রমিজ পাগল তার বুকের পোড়া দাগ দেখানো শেষ করবে, আমি তখন খুঁজে নেবো তোমাকে। আমি বিধাতার চোখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দেখতে চাই, দেখতে চাই সিদ্ধান্তহীনতা বিধাতাকে পোড়াবে কতটুকু? আর সেদিন যদি আমার এতটুকু স্বকীয়তা বজায় থাকে তবে জুয়া ধরে বসব, বিধাতা আরও একবার বলতে বাধ্য হবেন 'কুন', সৃষ্টি হবে বেহেশত-দোযখের চেয়ে ভিন্ন কোনো স্থান... নাম যার 'এক কিলো'...

কিন্তু সেদিন... একটু পরেই হামজা আনোয়ার নির্ভুলভাবে গেয়ে ফেলেন সেই গান... সুমনের গান... 'তিনি বৃদ্ধ হলেন, বৃদ্ধ হলেন... বনস্পতির ছায়া দিলেন...'

এই 'বৃদ্ধ' আর 'বুড়া' শব্দদুটো মনে হয় এক নয়, জেসমিন। 'বৃদ্ধ' শব্দটা বুঝি 'বুড়া' শব্দটার চেয়ে ভারী আর অনেক বেশি পরিণত... কারণ আমি 'বুড়া' হচ্ছি অথচ সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যদি পেছনে তাকাই, দেখি ছায়া নেই কোনো, বনঃস্পতি দূরে থাক, গুল্ম বা বিরুৎ এদেরও তো ছায়া থাকে... আমার নেই... ছায়া নেই কোনো... আমি তীব্র আতঙ্ক নিয়ে অন্ধকারে ছুটে যাই। অন্যের কাছ থেকে আয়ু চুরি করে বেঁচে থাকাটাকে ইদানিং খুব ক্লান্তিকর মনে হয়, মনে হয় অন্ধকারে মুখোমুখি বসবার কেউ থাকবে না, আসলে কেউ থাকে না জেসমিন।

'আলো নিভে যায় তো যাক
আসুক আঁধার ততটুকুই-
অন্তত যাকে বলে অন্ধকার,
জীবন যায় যাক চলে অপেক্ষায়
আরেকবার মুখোমুখি বসিবার।'

# অবিশ্বাসের পাথরে খোদাই যেন সে চোখ

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
সিনিয়র ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
বাবিলন গ্রুপ

১১

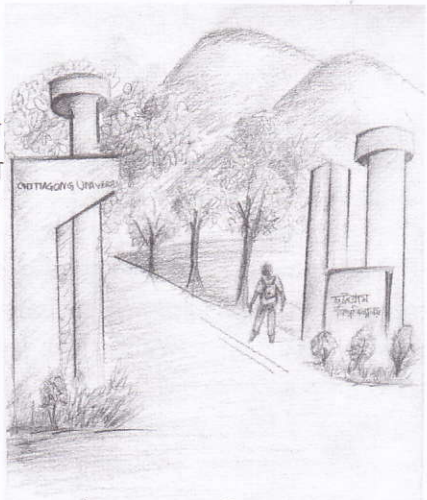

গল্পটা একুশ বছর আগের। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় আছি। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর আর চট্টগ্রাম ঘুরে ঘুরে তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে সোজা বাড়িতে চলে গেলাম। অখণ্ড সময় তখন বাউন্ডুলে হবার। বাড়িতে নানু একা তার নিঃসঙ্গ সংসার যাপন করছেন– তাঁর সাথেই জীবন যাপন; আমার সমস্ত জ্বালাতন, আবদার সবই সীমাহীন প্রশ্রয় পায় তাঁর কাছে। বিকেল কাটে বাজারের মাঠে ক্রিকেট কিংবা ফুটবলে। সন্ধ্যার পর ধুন্ধুমার আড্ডা– ঐ বাজারেই। কোনো কোনোদিন বেরিয়ে পড়ি গন্তব্যহীন যাত্রায়। আমার আবাল্য বন্ধু রনজু, লিটু এবং আমি– এই ত্রয়ীর তিন জোড়া পায়ের নীচে ক্ষেত-মাঠ-জঙ্গল-নদ-নদী-গ্রাম ভীষণ পরাস্ত তখন। ওদের দুজনেরই আবাস বাজারের সাথেই প্রায়। আমারটা কিলোমিটার খানেক দূরে। গভীর রাতে আড্ডা শেষে ওরা উত্তরমুখি হয় আর আমি দক্ষিণের দিকে পা চালাই। গা ছম ছম করা দুএকটা জায়গা অতিক্রমের সময় হার্টবিট বাড়ে। অনেক অনেক ভয়ের কিংবদন্তীগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। গুনগুন করতে থাকা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর উঁচু থেকে উঁচু হয়। গলা ফাটানো গানে ভূত তাড়াবার চেষ্টা করতে করতে একসময় বাড়ি পৌঁছে যাই। নানু কিছুক্ষণ বকবক করতে করতে দরজা খোলেন। বসে বসে আমার গভীর রাতের খাওয়া তদারকি করেন আর উপদেশ দিতে থাকেন– এত রাতে বাইরে থাকা ঠিক না, সাপ-খোপ, ভূত-প্রেত, চোর-ডাকাত ইত্যাদি ইত্যাদি– তারপর শুয়ে পড়েন। আমি আলোটা জ্বেলে রেখে ভোরের কাগজের পাতায় পাতায় পছন্দমতো খবরগুলোর উপর চোখ বুলাতে বুলাতে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার নানু এখনো বিদ্যমান– ছিয়ানব্বই বছরের বৃদ্ধা। কমতে থাকা চলৎশক্তি আর ক্রমহ্রাসমান অনুভূতিশক্তির মাঝেও আমার উপস্থিতি এখনো তাঁকে পুণরুজ্জীবিত করে। কোত্থেকে এত ভালোবাসা ঐ বুড়ো হৃদয়ে এখনো সঞ্চিত করে রেখেছেন আমার জন্য আমি তার কোনো কূল-কিনারা করতে পারি না। এই টানেই আমি সুযোগ মিললেই বাড়ি ফিরি। এই মূর্তিমান বটবৃক্ষের দীর্ঘ ছায়ার নিচে নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হয়।

তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলেও আমার দুর্বলতা ছিলো চট্টগ্রামের প্রতি একটু বেশি। মাধ্যমিক পড়াশুনা চট্টগ্রামে করার কারণে ওখানে বেশ কয়েকজন হরিহর আত্মার বন্ধু তৈরি হয়েছিল। সেই সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ি জংগলের নিসর্গও বেশ মনে ধরেছিল আমার। মাধ্যমিকের বন্ধু ওয়াসিও আমার সাথে একজোট, একসাথেই ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছি আমরা। ওকে বলেছিলাম রেজাল্টের খবর জানাতে এবং ভাইভার তারিখ পড়লে জানানোর জন্য। একটা আত্মবিশ্বাস ছিলো– টিকবোই।

ঐ সময়ে আজকের মতো এত মুঠোফোন ছিল না, সবেমাত্র প্রচলন শুরু হয়েছিল এই জাদুকরি জিনিসটার। প্রায় ইটের মতো সাইজের এন্টেনাওয়ালা একটা ঢাউশ আকৃতির সেট কালেভদ্রে দুয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তির হাতে দেখা মিলতো– সিটিসেল কোম্পানির।

বিকেলে যথারীতি ক্রিকেট খেলার জন্য বাজারের দিকে পা বাড়িয়েছি– চট্টগ্রাম থেকে আগত স্বশরীর বার্তাবাহকের সাথে দেখা। আমাকে দাঁড় করিয়ে একরকম গড়গড় করেই বলে চলেছেন– তোমার এখনি চট্টগ্রাম রওনা হতে হবে, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইভা আগামীকাল। তোমার বন্ধু ওয়াসি এসে খবর দিয়ে গেছে। দশটায় ভাইভা শুরু হবে। বার্তাবাহক জাকির মামা চট্টগ্রামেই চাকরি করেন। চট্টগ্রামে আমার আবাস ছিল খালুর বাসায়। খালুই বার্তাবাহককে জরুরি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

মুকসুদপুর থেকে চট্টগ্রাম– কম করে হলেও চারশ কিলোমিটারের মতো পথ, তাও আবার সরাসরি যোগাযোগ নেই। হাতে মাত্র কয়েক ঘন্টা। মাথা কোনো কাজ করছিল না। সকালে হলেও সরাসরি ঢাকার গাড়ি পাওয়া যেত। চিন্তার সময় কম। বাড়ি ফিরে গিয়ে হাতের কাছে যা ছিলো ব্যাগে ভরলাম। নানুর কাছ থেকে আরো কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় মাসাধিককাল নানুর সাথে বসবাস করছি। এ রকম অকস্মাৎ বিচ্ছেদে মন খারাপ লাগছিল খুব– বাইশ বছর পরেও বেশ মনে পড়ে আমার। নানুর কান্নার কথাও বেশ স্মরণ করতে পারি।

আমার বাজার থেকে লোকাল বাসের অপেক্ষা শুরু হলো। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। প্রতি মিনিটের অপেক্ষা স্নায়ুর উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বাজার থেকে বরইতলা– নয় কিলোমিটারের পথ প্রায় চল্লিশ মিনিট পার হলো পাড়ি দিতে। বরইতলায় অপেক্ষা করছি আরেকটা লোকাল বাসের জন্য। ফরিদপুর পর্যন্ত যেতে পারব এইটাতে। মিনিট দশেকের মধ্যে একটা বাস পেলাম। আরো মিনিট পাঁচেক পরে যাত্রা শুরু হলো। লোকাল বাস বলে কথা। যেখানে মানুষ দেখে সেখানেই থামে। যেখানে মানুষ নেই সেখানেও পারলে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষা করে। ড্রাইভার আর হেলপার গন্ডার প্রজাতির। মানুষের চিল্লাচিল্লিতে ওদের কিছু যায় আসে না। বরইতলা থেকে ফরিদপুরের দূরত্ব বড়জোর পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ এক ঘন্টার পথ। অথচ প্রায় গোটাবিশেক স্টপেজে থেমে থেমে ঐতিহাসিক বাসটা মহামূল্যবান দুই ঘন্টার মৃত্যু ঘটিয়ে যখন গন্তব্যে পৌঁছাল

তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে।

বাস থেকে নেমে লাইনে থাকা আরেকটা ঐতিহাসিক লোকাল বাসে উঠে পড়লাম গোয়ালন্দ ঘাটের উদ্দেশে। ফরিদপুর থেকেও ঢাকাগামী কোনো ডাইরেক্ট বাস পাওয়া গেল না। মিনিট পনের স্টেশনে গোংড়াতে গোংড়াতে বাসটার যাত্রা শুরু হলো। সিট থেকে উঠে ড্রাইভার সাহেবকে কিসফিস করে আমার বিপদের কথা জানালাম। সে আমার দিকে বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকাল। মনে হলো কিছুটা কাজ হতে পারে। আমার প্ল্যান ছিল– যেকোনোভাবে রাত এগারটার মধ্যে গাবতলী পৌঁছানোর। রাতের শেষ বাসটা ধরতে পারলেও সকাল আটটার মধ্যে চট্টগ্রাম পৌঁছানো সম্ভব। ওখান থেকে ঘন্টাখানেকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানো অসম্ভব কিছু না। যাত্রার শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে লোকাল বাসটা তার কেরামতি দেখাতে শুরু করল যথারীতি। এই পথের দূরত্বও পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের মতোই। অথচ রাত সাড়ে তিনে গোয়ালন্দ পৌঁছালো মান্যবর বাস চালক। নদী পার হতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। লঞ্চে পার হতে পারলে সময় কিছুটা কম লাগবে ফেরির তুলনায়। দ্রুত পায়ে লঞ্চঘাটে হাজির হলাম। সারি সারি পন্টুনে বাঁধা লঞ্চগুলো, ঘাটে কোনো যাত্রীটাত্রী নাই। জানা গেল লঞ্চ মালিকদের ধর্মঘট চলছে। সময় খারাপ মনে হচ্ছে। ফেরি ধরতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। একটা ভ্যানগাড়িতে চড়ে ফেরিঘাট পৌঁছানো গেল। লোড-আনলোড মিলিয়ে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় ব্যয় করে আরিচা ঘাটে এসে নামলাম। ঢাকার নিয়মিত বাস খুব একটা নেই। সাড়ে দশটা বাজে এখন। ইতিমধ্যে ফেরি থেকে নামা ঢাকা গমনেচ্ছু কতিপয় যাত্রীর হদিস মিলল। সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে একটা মিনিবাসের সাথে দরকষাকষি হলো– রিজার্ভ হিসেবে। ভীষণ ক্ষুধা অনুভব হচ্ছিল পেটে কিন্তু খাওয়ার তাগিদ টের পাওয়া গেল না। মিনিবাসটির কন্ডিশনটা খুব সুবিধাজনক না। ফিটনেস সার্টিফিকেট আছে কি না সন্দেহ। তবুও তো যেতে হবে। গাড়ি চলতে শুরু করল। গতিহীন একটা গাড়ি চলছে শব্দ তুলে, রাতের অন্ধকার ফুড়ে– তার আবার একটা চোখ অন্ধ, বামদিকের হেড লাইটটা নষ্ট। ইঞ্জিনের ব্যারোমিটারে পারদের উচ্চতা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। মানিকগঞ্জ শহরের একটু আগে গাড়িটা থেমে গেল। বাকি হেড লাইটটাও অচল হয়ে গেল। বাস্তব জীবনে আজকের মতো পোড় খাওয়া কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তখন পর্যন্ত। নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ড্রাইভার এবং হেলপার মিলে গাড়ির কোনো গতি করতে পারল না। চারদিক নীরব হয়ে আছে। রাস্তায় খুব একটা গাড়িটাড়িও নাই দুই একটা পণ্যবাহী ট্রাক ছাড়া। দুএকটা নাইট কোচ দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। স্থানীয় দু'একজনের সাথে কথা হলো। তারা আমাদের বুদ্ধি দিলেন মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে যেতে পারলে কিছু একটা পাওয়া যেতে পারে। দেরি না করে সদলবলে হাঁটা শুরু করলাম। অন্ধকার রাতে দশ বারো জনের একটা দল– টহল পুলিশের জেরার মুখে পড়লাম। তারা আমাদের দুঃখ বুঝল। আজকের দিন হলে কী হতো বলা মুশকিল। চাঁদা তুলে পুলিশকে

চাঁদা দিতে হতো হয়তো। আমার মতো এতটা তাড়া হয়তো বাকিদের ছিল না কিন্তু দ্রুত হেঁটে সবাই মানিকগঞ্জ পৌঁছালাম। বাসটাসের কোনো দেখা পেলাম না। একটা মাইক্রোবাস পাওয়া গেল– ঢাকা ঢাকা করে ডাক ছাড়ছে। বেশ বড়সড় মাইক্রোটা। চালকের সাথে দফারফা শেষে দশ বারো জনের দলটা চেপে বসলাম অনেকটা গাদাগাদি করে।

চট্টগ্রামের রাতের বাস ধরাটা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না আর। ইতিমধ্যে বারোটা বেজে গেছে। ঢাকা যেতে কত বাজবে কে জানে? আবার যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে সকালেও পৌঁছতে পারব না ঢাকায়। আমার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল মনে হয়। রাত বরাবরই আমার কাছে বেশ রোমান্টিক। এর একটা ভিন্নতর রূপ আছে। আজ এই হেমন্তের রাতে সমস্ত রোমান্টিকতা উধাও।

যতদূর মনে পড়ে রাত দেড়টার দিকে গাবতলী পৌঁছতে পারলাম। ইউনিক পরিবহনের কাউন্টারে আমার এক পরিচিত স্টাফ ছিল। বহুবার এই কাউন্টার থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছি। ভদ্রলোক আমার কাহিনি শুনে হা-হুতাশ করলেন। পরের গাড়ি সকাল ছয়টায়। চট্টগ্রামে পৌঁছাবে একটা নাগাদ। জ্যাম থাকলে বেশিও লাগতে পারে। অগত্যা রাতের বাকি সময়টুকু কাউন্টারের চেয়ারে হেলান দিয়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে পার করা গেল। যথাসময়ে গাড়ি ছাড়ল। সময়মতো পৌঁছতে পারলে দুইটা, আড়াইটা নাগাদ ভার্সিটিতে হাজির হওয়া সম্ভব। বোর্ডকে অনুরোধ উপরোধ করে ভাইবার একটা ব্যবস্থা করা যেতেও পারে। শেষ আশাটা মৃতপ্রায় হলেও একেবারে মরে যায়নি। ক্ষুধা-পিপাসা আর হতাশা-অনিশ্চয়তায় চরম ক্লান্তি চোখে-মুখে। বাসের সিটটাকে যথাসম্ভব সটান করে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছি– কিছুতেই ঘুম আসছে না। বাস চলছে অনেকটা নির্বিঘ্নে। সময় গড়াচ্ছে সীমাহীন দ্রুততায়। চৌদ্দগ্রামের একটা স্ট্রিট রেস্তোরায় যাত্রা বিরতি দেয়া হলো। বিশ মিনিটের। অহেতুক এই বিরতির কী দরকার ছিল! অথচ অন্য সময়ে এই রকম একটা বিরতির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। বাস থেকে আর নামলাম না। বসে বসে কামনা করছি সবাই যেন খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। ইউনিক পরিবহনের পরিচিত স্টাফ ভদ্রলোক ড্রাইভারকে কিছু একটা বলে দিয়েছিল বোধ হয়। ড্রাইভিংয়ের ধরন দেখে তাই মনে হচ্ছিল। আমি বসে আছি দেখে দূর থেকেই বলে উঠলেন– কি ভাই নামবেন না? নেমে চোখে মুখে পানি দিয়ে কিছু একটা খেয়ে নেন। অত চিন্তার কী আছে। লোকাল বাসের সেই নির্দয় ড্রাইভারের সাথে এই মহানুভব মানুষটাকে মেলানোর চেষ্টা করছি। ভালো মানুষ, মন্দ মানুষ কত মানুষ এই দুনিয়াতে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই ফিরে এসে স্টিয়ারিং এ বসে গাড়িটা স্টার্ট দিলেন ভদ্রলোক। সকল যাত্রী তখনও বাসে ফেরেনি। হর্ন দিয়ে যাত্রীগণের মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন ড্রাইভার সাহেব। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ হোক বা না হোক তার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকবে আজীবন।

মাঝে মধ্যে দুএকটা সাপ্তাহিক সবজি বাজারের যানজট ছাড়া আর কোনো বড় রকমের বিপত্তি ঘটেনি এখনো। সংশয়ের দোলাচলে ভাসতে ভাসতে কাটায় কাটায় একটার সময় চট্টগ্রামে নামলাম। ড্রাইভারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা স্কুটারে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাত্রা শুরু হলো। টেনশনের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে আবার, যতই ভার্সিটির নিকটবর্তী হচ্ছি। পথ আর শেষ হতে চায় না। মনে হয় অনন্তকাল ধরে রাস্তায় চলেছি। আমাকে যদি পারমিট না করা হয় ভাইভার জন্য! কীভাবে বোর্ডকে ম্যানেজ করা যাবে? এই কষ্টসাধ্য দম আটকানো যাত্রার কাহিনিটা বললে ওনারা কি সদয় হবেন? কীভাবে শুরু করা যায় আবদারটা– সাত পাঁচ ভাবছি। হঠাৎ ড্রাইভার বললেন ভাই কোথায় নামবেন– আমরা এসে গেছি তো। আমি বললাম– সোজা রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সামনে।

কেমন যেন সুনসান মনে হচ্ছে ক্যাম্পাসটা। লোকজন একেবারেই কম। দু'একজন ছাত্রছাত্রীর দেখা মিলল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তাদের চলাফেরায় আয়েশি ভাব অনেকটা। দুরু দুরু মন নিয়ে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। বিশাল বটগাছটার নিচে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে দুজন, বেশ স্মার্ট আর ভরসা মাখা চেহারা নিয়ে। রানিং স্টুডেন্ট মনে হয়। আমি এগিয়ে গিয়ে সালাম দিলাম। হড়বড় করে আমার দুর্ভাগ্যের গল্পটা বলে সাহায্য চাইলাম বিনয়ের সাথে। আমার বিধ্বস্ত শরীর আর চোখ-মুখের হতাশা দেখে ওরা বেশ সহানুভূতি দেখাল। এদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল– তুমি গোপালগঞ্জ থেকে এসেছ– ওটা আমার নেতার দেশ, তুমি নেতার দেশের মানুষ। বসো এখানে। আমি ইতস্তত করছিলাম। ভদ্রলোক আমার হাত ধরে এক রকম টেনে বসাতে বসাতেই নিজের পরিচয় দিলেন। নামটা আমার স্পষ্ট মনে আছে– প্রত্যয় জসীম। চোখে মুখে আসলেই একটা প্রত্যয় লক্ষণীয় তার। কথা বলেন বেশ সুন্দর করে। খুব সুন্দর করেই বললেন– আচ্ছা, ধরো তোমার ভাইভার তারিখটা যদি কোনো কারণে পিছিয়ে দেয়া হয় তাহলে তুমি খুশি হবে? আমি তার প্রত্যয়ী মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। আমাকে বললেন নোটিশটা দেখে আসো। আমি ভয়ে ভয়ে নোটিশটার কাছে গিয়ে দেখলাম– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমণ উপলক্ষ্যে আগামী ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এই সময়ে অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষাসমূহ যথারীতি নিম্নবর্ণিত রুটিন অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। নিম্নবর্ণিত রুটিনের দিকে মনোযোগ দিলাম। আমার ভাইভা পরীক্ষার সময় প্রায় পনের দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে...

# জাহাজীর কথকতা

মোঃ জাবেদ মাহমুদ সবুজ
মেরিন অফিসার, ক্লাস-৩ (ডেক)
ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

দুটি জিনিসের সীমা দেখা যায় না। এক আকাশ, দুই সাগর। আপাতদৃষ্টিতে সাগর/ মহাসাগরের সীমা পরিসীমা না দেখা গেলেও বাস্তবিকপক্ষে সীমা, পরিসীমা, আয়তন, গভীরতা সবই আছে। এসব সাগর/ মহাসাগরের বুক চিরে প্রতিনিয়ত ভেসে চলে অগণিত বাণিজ্যিক জাহাজ। যেমন বিশাল তাদের আকার তেমন বিশাল তাদের ধারণক্ষমতা। আর আছে গতি, নিরন্তর ছুটে চলা। জীবনধারণের সব উপকরণ বিদ্যমান এসব জাহাজে, আছে আনন্দ বিনোদনের সকল সুবিধা। এরকম একটি রোমাঞ্চকর জীবনের জন্য বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে যোগদান করি ২০১১ সালে। প্রথমদিনই যে জয়েনিং ট্রেডিশন পেয়েছিলাম তা কখনো ভুলবার মতো না। শুরু হয় দুই বছরের কঠোর রেজিমেন্টাল প্রশিক্ষণ। সকালবেলা ফজরের পর থেকে শুরু হতো পিটি, তারপর প্যারেড ক্লাস, বিকালবেলা খেলাধুলা, সন্ধ্যার সময় ক্লাস রুমে পড়াশুনা। এসবের মাঝে সারাদিন সিনিয়রদের পানিশমেন্ট। মাথায় তখন চিন্তা কীভাবে একাডেমি ছেড়ে দিব। তারপরও দাঁতে দাঁত চেপে সবকিছু সহ্য করে প্রথম বছর পার করলাম। ফলাফলও ভালো ছিল। নটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে প্রথম হলাম। দ্বিতীয় বছরে সিনিয়র হওয়ার সাথে সাথে কষ্টের মাত্রাও কমে গেল। তখন চিন্তা কীভাবে ভালো ফলাফল করে বিদেশি কোনো শিপিং কোম্পানিতে চাকরি পাওয়া যায়। সেই আশাটাও পূরণ হলো। জুনিয়র লাইফে প্রথম হওয়ার সুবাদে জাপানি শিপিং কোম্পানি 'কে-লাইন' এ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাই এবং নির্বাচিত হই। এরপর আরেকটি বছরও সফলতার সাথে শেষ করে একাডেমি থেকে পাশ করলাম।

তারপর শুরু হলো জাহাজী জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি। পাসপোর্ট, সিডিসি (নাবিকদের বিশেষ বই), মেডিক্যাল চেকআপ ইত্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর জাহাজে যোগদানের তারিখ ঠিক হলো। কিন্তু জাহাজে যোগদানের কিছুদিন আগে থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড জ্বর। ডাক্তার বলল ম্যালেরিয়া। অনেক উচ্চ ডোজের ঔষধ খেলাম। কিন্তু জ্বর কমলো না। আব্বা আম্মাতো দিশেহারা। দোটানায় পড়ে গেলাম যাবো কি যাবো না। এজেন্সির সাথে কথা বললাম। তারা বলল সবকিছু ঠিক হয়ে আছে এখন বাতিল করলে পরে সমস্যা হতে পারে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না কী করব। ফ্লাইটের তারিখ চলে আসলো। জ্বরও আগের মতো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যাবো। চোখের জলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাতের ফ্লাইটে উঠলাম। অসুস্থতার মাঝেও প্রথমবার প্লেনে চড়ার রোমাঞ্চ কাজ করছিল। জয়েনিং মিশরের সুয়েজ খাল থেকে। মাঝখানে ট্রানজিট ছিল আবুধাবিতে। পরদিন সকালে কায়রো পৌঁছলাম। সেখান থেকে গাড়িতে রওনা হলাম পোর্ট সৈয়দ। তিন-

সাড়ে তিন ঘন্টার জার্নি ছিল। ঘুম ঘুম চোখে মিশরের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। চারদিকে শুধু ধু ধু বালি, কড়া রোদ আর খেজুর গাছ। গোটা মিশরটাকে মরুভূমি মনে হলো। কোথাও কোনো সবুজের চিহ্ন নেই। দেশের গাছপালার ছবি চোখে ভাসতে লাগল। জ্বরের জন্য শরীর খুব দুর্বল ছিল। একসময় ঘুমিয়ে গেলাম। গাড়ি দুপুর নাগাদ পোর্ট সৈয়দের এক হোটেলে এসে থামল। সন্ধ্যা পর্যন্ত হোটেলে থাকতে হবে। হোটেলের রুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম। হোটেলের লোকের মাধ্যমে একটি সিমকার্ড কিনে বাসায় ফোন করলাম। বাসার কেউ তখন কথাই বলতে পারছে না। আব্বা আম্মা নাকি পাগলপ্রায়। সান্ত্বনা দিলাম জ্বর ভালো হয়ে গেছে।

জোহরের শেষ করে আবার ঘুম দিলাম। একটু বাইরে ঘোরার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শরীর সায় দিলো না। সন্ধ্যার সময় উঠে ডিনার করলাম। এজেন্ট হোটেলের লোকদের মাধ্যমে জানিয়ে দিলো সাতটার সময় তৈরি থাকতে। যথাসময়ে সে এসে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে আমার সম্পর্কে জানতে চাইল। তাকে সবকিছু বললাম। সে বলল সব ভালো হয়ে যাবে। তারপর তার সাথে বের হলাম। পোর্ট ইমিগ্রেশনে গেলাম, তারা কিছু জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ারেন্স দিল। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বোটে উঠলাম সুয়েজ খালের উদ্দেশে যেখানে জাহাজ নোঙর করা আছে। বোট যখন জাহাজের কাছাকাছি আসলো অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম এত বড় জাহাজ দেখে। একাডেমিতে পড়ার সময় কর্নফুলিতে অনেক জাহাজ দেখেছি। কিন্তু এত বড় জাহাজ এই প্রথম দেখলাম। জাহাজের নাম হিউস্টন ব্রিজ। কন্টেইনারবাহী জাহাজ, লম্বায় প্রায় ৩৪০ মিটার এবং প্রস্থে প্রায় ৫০ মিটার। ওজন এক লাখ টনেরও বেশি। জাহাজটি সাড়ে আট হাজার কন্টেইনার পরিবহনে সক্ষম। জাহাজে ডিকট আছে চৌদ্দ তলা পর্যন্ত। সাগরে প্রতিদিন তেল পোড়ায় এক থেকে দেড় কোটি টাকার মতো। যাহোক, নিরাপদেই জাহাজে উঠলাম। এজেন্ট বিদায় জানিয়ে চলে গেল। জাহাজের লোকজনের সাথে পরিচিত হলাম। জাহাজে ছিল বাংলাদেশ, ভারত আর বার্মিজ লোকজন। বাংলাদেশি সেকেন্ড অফিসার আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমার কেবিন দেখিয়ে রেস্ট নিতে বললেন। রাত তখন প্রায় এগারটা। নোঙরে থাকায় বেশিরভাগ লোকজনই তখন ঘুমে। আমি কেবিনে গিয়ে ওযু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলাম জ্বরটা ভালো করে দেয়ার জন্য। আল্লাহর কি অশেষ রহমত! সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলাম জ্বর একদমই ভালো হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে জাহাজও নোঙর উঠিয়ে চলা শুরু করেছে। শুরু হলো আমার ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার প্রথম দিন। ধীরে ধীরে জাহাজের সবার সাথে পরিচয় হলো। ক্যাপ্টেন ছিলেন ভারতীয় আর চীফ ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশি। প্রথম পোর্ট ছিল সিঙ্গাপুর। খুব উত্তেজনা কাজ করছিল পোর্টে ঢোকার আগে। এভাবেই দেখতে দেখতে প্রথম চার মাসের প্রাথমিক ট্রেনিং শেষ হয়ে আসলো। যথাসময়ে দেশে আসলাম নেদারল্যান্ডের রটারডাম থেকে। এর কিছুদিন পর আবার শিপে জয়েন করলাম আট মাসের মূল ট্রেনিংয়ের জন্য। আল্লাহর রহমতে সেটাও শেষ করে দেশে এসে পরীক্ষা দিলাম অফিসার হওয়ার জন্য। পরীক্ষায় পাশ করলাম।

অফিসার হওয়ার সনদ পেলাম। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আরো কয়েকবার জাহাজে গিয়েছি। এখন সেই একই কোম্পানিতে থার্ড অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। এরই মধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, ইউএসএ, ইসরাইল, তুরস্ক, কাতার, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, চীন ও মিশর। সাধারণত ছয় মাস শিপে থাকার পর দুই/তিন মাস দেশে থাকা যায়। এতদিন জাহাজে থাকার পর জাহাজের কিছু বিষয় আমার কাছে অদ্ভুত বা মজার মনে হয়েছে। সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি–

* জাহাজ সাগরে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলাচল করে। এই গতি যেকোনো সময় বাড়ানো/ কমানো যায় না। শুধু জাহাজের কোর্স যেকোনো সময় পরিবর্তন করা যায়।
* শুধুমাত্র ছোট্ট একটি নবের সাহায্যে আঙ্গুলের মাধ্যমে এত বড় একটি জাহাজের কোর্স ঘুরানো যায়। যেটিকে বলা হয় অটো পাইলট।
* অনেকের ধারণা জাহাজ রাতের বেলা থেমে থাকে। আসলে জাহাজ দিনরাত চব্বিশ ঘন্টাই চলে।
* মাত্র পনের থেকে বিশ টনের একটি নোঙরের সাহায্যে এক লাখ টনেরও বেশি জাহাজকে পানিতে আটকে রাখা যায়।
* বর্তমানে আধুনিক জাহাজগুলোর ইঞ্জিন হলো ইউএমএস (আনম্যানড মেশিনারি স্পেস)। যেগুলোতে ইঞ্জিন রুমে মানুষ না থাকলেও চলে।
* জাহাজ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (পৃথিবীর মানচিত্রে ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ অঙ্কিত কাল্পনিক রেখা) অতিক্রম করলে জাহাজের ঘড়ির সময় একদিন এগিয়ে বা পিছিয়ে দেয়া হয়।
* অনেক জাহাজ বিষুবরেখা অতিক্রম করলে সেখানে ক্যাডেটদের ন্যাড়া করে পার্টি দেয়া হয় এবং সাথে সার্টিফিকেটও দেয়া হয়।
* জাহাজে অল্প ব্যবধানেই আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন হতে পারে, যেমন– আজ বরফ পড়া ঠাণ্ডা তো কয়েকদিনের মধ্যেই কড়া রোদ।

এমন আরো অনেক মজার ও অদ্ভুত বিষয় রয়েছে। জাহাজে আছে হাসি, মজা, আনন্দ, দুঃখ সবকিছু। আছে বিনোদনের উপকরণ, জিম, খেলাধুলার সামগ্রী, ইন্টারনেট, সার্বক্ষণিক কথা বলার জন্য ফোন, ছোটখাটো হাসপাতাল। আর নিয়মিত পার্টি তো আছেই। তবে কাজের পর বিশ্রামের সময় খুব সীমিত। থাকা খাওয়ার মান খুবই উন্নত। হয়তো দু একটি কোম্পানিতে ভিন্ন হতে পারে। এরপরও নাবিকদের কষ্ট থেকেই থাকে। সেটা হলো পরিবার পরিজন ছেড়ে থাকার কষ্ট। তারপরও তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই জাহাজে চাকরি করা।

পৃথিবীর ৯০ শতাংশেরও বেশি আমদানি-রপ্তানি হয় জাহাজে করে। জাহাজ না চললে গোটা

পৃথিবীর ব্যবসা বানিজ্যই থমকে যাবে। আফ্রিকার অনেক দেশের লোক না খেয়ে থাকবে– সেখানে প্রতিনিয়ত খাদ্যশস্য যাচ্ছে জাহাজের মাধ্যমে। আমাদের দেশের আমাদানি রপ্তানিও বহুলাংশে জাহাজের মাধ্যমেই হয়। এই মহান দায়িত্ব পালনে ক্ষুদ্রতম অবদান রাখতে পারছি বলে ভালো লাগে। যদিও নাবিকদের ব্যাপারে অনেকের মনে বিরূপ ধারণা রয়েছে। আমি বলব গুটি কয়েক আছেন হয়তো এমন, তবে বেশিরভাগই ভালো। তাদের কাছে পরিবার প্রিয়জনই সবার আগে।

দেশের উন্নয়নে মেরিনারদের যথেষ্ট অবদান আছে। তাদের মাধ্যমে প্রতিবছর দেশে বিশাল অংকের রেমিট্যান্স আসে। কিন্তু তা সবার নজরে আসে না। বর্তমানে এই সেক্টরে চাকরি সংকট, ভুয়া সনদপত্র দিয়ে অযোগ্য লোকদের জাহাজে প্রেরণ, চাহিদার তুলনায় অত্যধিক বেসরকারি একাডেমি গড়ে ওঠা, বাংলাদেশি মেরিনারদের ভিসা সমস্যাসহ অনেক সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের সুদৃষ্টিই পারে এসব সমস্যার সমাধান করতে। সে আশাই রইল।

মানুষকে প্রতিটা মুহূর্তেই সংগ্রাম করতে হয়। কখনো একা কখনোবা কারো সহায়তায়। আমার এই দীর্ঘ পথচলায়, আমার এই আজকের অবস্থানের পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান অবশ্যই আমার বাবা-মার। এরপর শিক্ষক, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব। আর বিশেষ করে বলতে হয় ব্যাবিলন গ্রুপের কথা। তাদের দেয়া শিক্ষাবৃত্তি লেখাপড়ার পথ আরও সুগম করে দিয়েছিল। যুগিয়েছিল ভালো ফলাফল করার অদম্য স্পৃহা। সেই ২০০৮ সাল থেকে তাদের সাথে পরিচয়। এখনো ব্যাবিলনের স্যাররা নিয়মিত খবর রাখেন কোথায় আছি, কেমন আছি! তাদের এই মধুর ব্যবহার, অকৃত্রিম আন্তরিকতা কখনো ভুলবার নয়। ব্যাবিলন গ্রুপের এই শিক্ষাবৃত্তির পরিসর আগের চেয়ে আরো অনেক বড় হয়েছে। আরও অনেক বেশি শিক্ষার্থী এখন এই বৃত্তি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে। আমি নিজেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সাথে যুক্ত থাকতে চাই এবং ব্যাবিলন গ্রুপের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

# স্বপ্নলোকের গল্পগাঁথা

কাজী এ এম তুষার আলম
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

১১

হ্যালো, সবুজ বলছেন?
জ্বি বলছি।
আমি তুষার, ব্যাবিলন গ্রুপ থেকে।
খানিকটা শ্রমের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত সবুজের সাথে মুঠোফোনের বদৌলতে যোগাযোগটা স্থাপন করা গেল। যদিও আমাদের প্রত্যেকটা ছাত্রের সাথেই নিয়মিত যোগাযোগ হয় তথাপি সবুজকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না তার দেশের বাইরে অবস্থানের জন্য।
স্যার! আসসালামু আলাইকুম। সবুজের অধিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ আমাকে কিছুটা সময়ের জন্য থামিয়ে দিলো। তার স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে গড়গড় করে বেরিয়ে এল পুরোণো দিনের জালবোনা স্মৃতিকথাগুলি– যখন আমরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম শিক্ষার অদম্য ইচ্ছার আলোকবর্তিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্য। তার কণ্ঠের গভীর উচ্ছ্বাস মনে পুলকের জোয়ার এনে দিলো। আমি ফোন দেওয়ার আগেও ভাবিনি সবুজের উচ্ছ্বাসটা আমাকে এভাবে আপ্লুত করবে। আমি যেন চাওয়ার চেয়ে বেশিই পেলাম। একই উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ২০১৬ সালের শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ কর্মসূচীতে তার স্বল্পসময়ের আবেগময়ী বক্তব্যে।

স্যার, অনেকদিন পরে কথা হলো। সবাই কেমন আছে?
আমি আছি বেশ ভালোই। আপনাদের কথা খুব মনে পড়ে, দেখা করতে ইচ্ছে করে কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় আসতে পারি না। তাছাড়া দেশে খুব একটা সময় থাকতেও পারি না।
সবুজের নিঃশ্বাসের উষ্ণ বাতাসে আরো অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে তা আমি ফোনের এ প্রান্ত থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আমি যেখান থেকে শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছি আপনি কি সেই ব্যাবিলন থেকে বলছেন?
আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশেই সবুজে ঘেরা মাধাইয়া বাজার ছাদিম উচ্চ বিদ্যালয়। কুমিল্লার চাঁদিনায় অবস্থিত বেশ পুরণো স্কুল এটি। স্কুলের সামনেই অবস্থিত শহিদ মিনারটি স্কুলের প্রায় সমবয়সী। আমাদের ভাষা চেতনার এই বেদিমূল স্কুলের প্রবেশমুখেই এক অন্যরকম সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাবেদ মাহমুদ সবুজ ২০০৮ সালে মাধাইয়া বাজার ছাদিম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাওতালা গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারের সংগ্রামী চালক রুস্তম আলীর ছেলে সবুজের উদ্দেশ্য ছিল কন্টকাকীর্ণ যাত্রায় স্বর্ণদ্বীপের সন্ধান। আজ সবুজের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। সে এখন একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্বীপ তার হাত চুম্বন করে চলেছে অনবরত। সবুজ তার স্বপ্ন ছুঁতে পেরেছে।

২০০৮ সালের কথা। ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কর্মসূচীতে আরেকটি অধ্যায় যুক্ত হবে- সেই আলোচনা সভায় ব্যস্ত মাননীয় পরিচালক আবিদুর রহমান স্যার। সভায় উপস্থিত উম্মে সালমা তালিয়া, মোহাম্মদ হাসান, সাইফুল হক ও সাইফুল ইসলামকে নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন তিনি। ব্যাবিলন গ্রুপের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মীদের উন্নয়নে ও দেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক কল্যাণে কাজ করার জন্য ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালকমণ্ডলীর আন্তরিকতা ও উদ্যোগের কোনো কিছুতেই কমতি নেই। শিক্ষাখাতে সহায়তার ব্যাপারে তখন পর্যন্ত ব্যাবিলনের গণ্ডিটা খুব বেশি কিছু ছিল না। আভ্যন্তরীণ কর্মচারী ও শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা তহবিল থেকে সাহায্য করা হতো নিয়মিতই। কিন্তু ব্যাবিলন পরিচালকমন্ডলী এর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে আর রাজি নন। আলোচনা সভায় সবারই মতামতের ভিত্তিতে চালু হলো দেশের অভ্যন্তরে দরিদ্র কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীগণের জন্য বৃত্তি প্রদান। লক্ষ্য ছিল এই অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীগণ শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে যাতে মুকুলেই ঝরে না পড়ে। এরই প্রেক্ষাপটে ২০০৮ সালে যারা এসএসসি পাশ করে তাদের কাছ থেকে দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়।

ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর এ আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হলো। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত আমাদের কাছে দরখাস্ত আসতে থাকল। জীবন সংগ্রামে শিক্ষা নামক অস্ত্র হাতে সাহসী ও বলীয়ান এসব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমরা একান্তভাবে কথা বলি। ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালকমন্ডলী থেকে শুরু করে শিক্ষাবৃত্তি কমিটির সবাই তাদের সংগ্রামের ইতিহাস শুনেছি। আমরা কখনো তাদের কান্নার সাথে ভারাক্রান্ত হয়েছি, কখনোবা তাদের সামান্য আনন্দেও আনন্দিত হয়েছি যা বলাই বাহুল্য। তাদের সংগ্রাম আমাদেরকে উৎসাহ দেয়, জানের চেষ্টা, ত্যাগ আমাদের অনুভূতিগুলোকে প্রতি মুহূর্তে নাড়া দেয়। তারা অপরাজেয় ও দুর্দান্ত অর তাই আমরা তাদের হাতে তুলে দেই আলোকবর্তিকা, জ্ঞানের মশালে আলো ছড়িয়ে দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াই শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ প্রথম পর্বের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান এর দিনক্ষণ ধার্য করা হলো। সাজ সাজ রব পুরো ব্যাবিলন গ্রুপে- অদম্য ও মেধাবীদের হাতে প্রথম পর্বের শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করা হলো। ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে বাংলাদেশ তখন পুরোটাই স্তব্ধ। ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তির অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিলো। আমাদের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবো কি না উপায়ান্তর পাচ্ছিলাম না। দূর-দূরান্ত থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এসেছে তাদের স্বপ্ন পূরণের বীজ হাতে নিতে। আমাদেরকে প্রায় অবাক করে দিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করলেন। যেকোনো সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মূল অবদান রাখে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা। রাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে যেমন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার তেমনি দরকার সামাজিক উন্নয়ন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় সমানে অবদান রেখে চলেছে। ইউনিলিভার, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন এনজিও নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তথা সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যাবিলন গ্রুপের নিরন্তর এই প্রচেষ্টা তারপরেও থেমে নেই। ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পটি আজকে ফুলে ফলে শাখা মেলে অষ্টম বৎসর পার করে দিলো।

কেমন আছ নুর মোহাম্মদ?
জ্বি স্যার, ভালো আছি।
নুর মোহাম্মদ কোনো অবস্থাতেই তার আবেগকে বেশিক্ষণ সংবরণ করতে পারল না। 'আপনাদের শিক্ষাবৃত্তি না পেলে হয়তো আমি আজকে এতদূর আসতে পারতাম না'– বলে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকল। আমিও খুব বেশি কিছু আর বলার সুযোগ পেলাম না। আমরা যতটুকুই তাদের দিয়েছি তার প্রতিদান যে এত বড় হতে পারে তা আমি ভাবতেও পরিনি। অবশ্যই তাদের ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার অবদানকেও আমরা অস্বীকার করি না। আমিও তার কথায় অনেকটা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। বগুড়া জেলার করতোয়া, নাগর ও গঙ্গাই নদীবেষ্টিত শিবগঞ্জ উপজেলার আটমুল ইউনিয়ন। নদীচরে বেড়ে ওঠা এই কিশোরটি আটমুল দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্বপ্ন পূরণের জন্য নেমেছিল রাস্তায়। বাবা আফসার আলীর চরম দরিদ্র পরিবারটি টিকিয়ে রাখার জন্য অতি অল্প বয়সে পরিবারটির কিশোর সদস্য কর্ম ও পড়াশুনা দু'টোই চালিয়ে যেতে থাকে। অত্যন্ত কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান নুর মোহাম্মদ এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে স্কুল ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করে। ব্যাবিলনের শিক্ষাবৃত্তির কল্যাণে নুর মোহাম্মদ তার মেধাকে জয় করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছে। আমাদের প্রাপ্তির খাতায় নুর মোহাম্মদ যেন আনন্দটা আরও একগুণ বাড়িয়ে দিলো। আফসার আলী ছেলের এই সাফল্যকে যদিও দেখে যেতে পারেননি তবে ওপরে বসে তার পুত্রের সাফল্য দেখে অবশ্যই সেও অনেক আনন্দিত।

ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কর্মকাণ্ডের প্রসার আজ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রায়শই আলোচনায় আসে। আর এ বিস্তৃতি শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাইরেও বিভিন্ন পোশাক ক্রেতামহলে এটি বিশেষভাবে সমাদৃত। Gulen Asnas and David Crowther এর সম্পাদনায় প্রকাশিত "Development in corporate governance and responsibility- Business strategy and sustainability" নামক পুস্তকে ব্যাবিলনের সিএসআর এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়। পুস্তকটি ২০১২ সালে Emerald group publishing limited, UK থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৪ সালে প্রকাশিত Safety and rights society এর প্রতিবেদনে ব্যাবিলন গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হাসান বলেছিলেন- ...the obligation of the firm to use its resources in ways to benefit society, through committed participation as a member of society, taking into account the society at large and improving the welfare of society at large independent of direct gains of the company.

কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালির দক্ষিণ রাখাইন পাড়ার থোইং এ- তার মা কায়ানের একমাত্র ভরসা। পিতৃহারা থোইংয়ের মা কাপড় বুনন শিল্পি। তৈরী পোশাকশিল্পের স্বর্ণযুগে এখনো তারা তাদের নিপুণ শিল্পের মাধ্যমে বিশ্বমর্যাদার আসন অলংকৃত করে রেখেছে। কায়ানের দিবারাত্র পরিশ্রম ও অন্তহীন মমতায় থোইং যুদ্ধ করে চলেছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে, সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। মহেশখালি মডেল হাইস্কুল থেকে ২০০৮ সালে এসএসসি তে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে স্কুল ও দক্ষিণ রাখাইন পাড়ার মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছে থোইং। সমুদ্রবর্তী প্রান্তিক জনপদে বাস করেও আজকে সাগর পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা তড়িৎকৌশল প্রকৌশলী সে। থোইং এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। এক সময় থোইং এর মায়ের প্রতিটি সুঁচের ভাঁজে থাকত দুঃখ ও দারিদ্রের বুনন কিন্তু আজ তার প্রতিটি সুঁচের বুননের ভাঁজে থাকে তৃপ্তি ও আনন্দের হাসি।

থোইংয়ের সাথে আমার টেলিফোনে আলাপ হয়-

আমি যদি ব্যাবিলন গ্রুপ থেকে বৃত্তি না পেতাম তাহলে হয়তো নিশ্বাসের সাথে দুঃখ ও দারিদ্রের পাশাপাশি জীবনযুদ্ধে চরম হতাশার চাপ ফুটে উঠত প্রতিটি পরতে পরতে। আমি ব্যাবিলন গ্রুপের কাছে আজীবন ঋণী থাকব- থোইং এর বক্তব্যে আমার শরীর শিহরিত হয়ে উঠল।

তোমরা যাতে আমাদের চেয়েও অনেক বড় হও সেই আশাবাদ ও দোয়া সব সময়ই আমাদের থাকে।

ভাইয়া, এমন কিছু বলবেন না যাতে আমি অপ্রস্তুত হয়ে যাই। থোইং এর বক্তব্যে আমার

আর বুঝতে বাকি থাকল না সুদূর মহেশখালির রাখাইন পাড়ায় প্রত্যেকটি মানুষের মায়াবী চোখ ব্যাবিলন গ্রুপের কল্যাণ কামনা করে।
আমরা শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের ৮ বছর পূর্ণ করে ফেললাম এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। এই তথ্যের প্রত্যুত্তরে থোইং এর উচ্ছ্বাস আমাকে আপ্লুত করল। সে যারপরনাই আনন্দ প্রকাশ করল। আরো কিছু দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থী তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে এজন্য এই প্রকল্পের দীর্ঘায়ু কামনা করল ঈশ্বরের কাছে।

মাহবুবুর রহমান পলাশ ২০০৮ সালে ব্যাবিলন গ্রুপের শিক্ষাবৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে এখানে আসে। তারই হাত ধরে থোইং এর আগমন। দু'জনেই পরম বন্ধু ও একই কলেজে পড়াশুনা শেষ করেছে। পলাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভাষা বিজ্ঞানে পড়াশুনা শেষ করেছে। পলাশও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে প্রতিনিয়ত দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আজ সফল যোদ্ধা। সে ব্যাবিলন গ্রুপের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে।

চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা আরও একজন ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সোনিয়া আক্তার। পাওয়ার এন্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তড়িৎ প্রকৌশলী হতে চায় সে। সোনিয়ারও চলার পথ সুগম ছিল না। তার বাবা শেখ হেমায়েত উদ্দিন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে- পেনশনের টাকায় সোনিয়ার পড়াশুনা চলছিল। কপোতাক্ষ নদ বেষ্টিত যশোরের সোনিয়া ২০০৮ সালে এসএসসি-তে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। কন্টকাকীর্ণ দুর্গম এই পথে ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি সাহায্যের যে হাত বাড়িয়েছে তার জন্য সে কৃতজ্ঞ। সোনিয়া তার অনুভূতিগুলোকে কলমবন্দি করে সবাইকে জানাতে চায় ব্যাবিলন কথকতার যে কোনো সংখ্যায়।

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে ২০০৮ সালের এসএসসি-তে গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রী নাইমা আক্তার তন্বী ও নাফীসা আক্তার তামান্না। দু'জনেরই পড়াশুনা চালিয়ে যেতে দু'টি পরিবারই যুদ্ধ করেছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে। তন্বীর বাবা মোখলেস উদ্দিন ও তামান্নার বাবা আমিনুল হক একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক। প্রচুর অধ্যবসায়ের ফলে তন্বী ও তামান্না দু'জনেই শিক্ষাজীবন শেষ করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত। তন্বী গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশুনা শেষ করে ইন্টার্ন ডাক্তার হিসেবে কাজ করছে। আমার মেয়েটা ডাক্তার হয়ে গেলরে ভাই- বলতে বলতেই একটা আনন্দের হাসি দিলেন মোখলেস উদ্দিন। তামান্নার বাবা চার ছেলেমেয়ের পড়াশুনার জন্য নিবেদিত প্রাণ। তিনি তামান্নাকে ২০০৮ সালের ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদন করতে বলেন। তামান্না ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভেটেরিনারি মেডিসিনে পড়াশোনা শেষ করে ইন্টার্ন করছে ও পাশাপাশি অষ্ট্রেলিয়ায় বৃত্তির জন্য চেষ্টা করছে।
মেয়েতো অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে চাচ্ছে ভাবতেই আমার কেমন লাগছে। মেয়েটা এত দূরে চলে যেতে পারে ভাবতেও পারিনি- বলছিলেন আমিনুল হক।

তামান্না, তন্বি, স্বপ্নপূরণে ব্যাবিলন যে শিক্ষাবৃত্তির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার জন্য ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন, আশির্বাদ করলেন এর পরিচালক পরিষদকেও।

এমনি করেই স্বপ্নের আলো হাতে নিয়ে প্রতিষ্ঠার জাল বুনে চলেছে ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা। কেউ ডাক্তার হয়ে, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আইন বিশেষজ্ঞ, আবার কেউবা শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও মেডিক্যালে পড়াশুনা করছে। শিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য সফল হয় একজন শিক্ষার্থীর সাফল্যের জন্য দিয়ে– যার স্বপ্ন দেখেছিলেন গত আট বছর আগে ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালকমণ্ডলী। ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিক্ষার্থীকেই সাহায্য করে চলেছেন পরিচালকমণ্ডলী। যেমন মাননীয় পরিচালক মইনুল আহসান স্যার ব্যক্তিগতভাবে তিনজনকে পড়াশুনার খরচ যুগিয়ে যাচ্ছেন। অনুপ্রেরণা ছড়িয়েছে কর্মকর্তাদের মধ্যেও। কমার্শিয়াল সেকশনে কর্মরত ফিরোজ আলম একজনের পড়াশুনার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের এটি আরেকটি অর্জন– ব্যক্তিগত পর্যায়েও কেউ কেউ সিএসআর কর্মকাণ্ড করে চলেছে বিচ্ছিন্নভাবে।

প্রাপ্তির আনন্দ সব সময়ই সুখকর। আমাদেরও তাই আনন্দের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে স্বপ্নের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে যেসব শিক্ষার্থী মাঠে নেমেছে তাদের সাফল্যগাঁথার গল্পগুলো। এভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে যদি প্রত্যেকটি সংগঠন তার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এগিয়ে আসে তবে শুধু অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জাতি নয় শিক্ষিত জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএম নজরুল ইসলাম ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানে বলেন– প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সমাজেই তার দায় পরিশোধ করে তবে দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের অকালেই ঝরে পড়াটা রোধ করা যায়। টিআইবি পরিচালক ডঃ ইফতেখারুজ্জামান ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তিকে কোনো দান হিসেবে নয়, এটা শিক্ষার্থীদের শ্রমের বিনিময়ে অর্জন বলে অভিহিত করেন যেটা আমরাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এক এক করে আমাদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান আসন অলংকৃত করেছেন দেশবরেণ্য ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, উপদেষ্টা-তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, পরিচালক, কেন্দ্রীয় কচি কাঁচার মেলা।

ব্যাবিলন গ্রুপের শিক্ষাবৃত্তির সাফল্যগাঁথায় অনেকেরই মধ্যে দু'জন শিক্ষার্থীর অকালমৃত্যু আজো আমাদের কাঁদায়। রূপসা ও ভৈরব নদীর ভালোবাসায় বেড়ে ওঠা প্রকৃতির কন্যা তামান্না আক্তার কাউকে কিছু না বলেই প্রকৃতিকে বিদায় জানায়। খুলনা জেলার অন্তর্গত খালিশপুরে তার বাবা আব্দুল জলিল তালুকদার এখনো হাতড়ে তার মেয়ের স্মৃতিকে খুঁজে বেড়ান। শিকেয় তুলে রাখা তামান্নার স্বপ্নগুলিকে মাঝে মাঝেই মনে করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তামান্না আক্তার অদম্য মেধাবী একজন ছাত্রী যার ডাক্তার হওয়ার অনেক ইচ্ছে

ছিল যেটা আজকেও স্বপ্ন থেকে গেল। তামান্নার মায়ের সাথে কথা বলতেই অঝোরে কেঁদে ফেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন– স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেলরে ভাই। তানজিলা আফরোজের মৃত্যুও আমাদেরকে অনেক কাঁদিয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীই ব্যাবিলন পরিবারের এক একটি সদস্য। তাই এদের আনন্দে আমাদের যেমন আনন্দ হয় তেমনি এদের কষ্টেও আমাদের তেমনি কষ্ট হয়। তামান্না ও তানজিলার প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা আজীবন থাকবে। তামান্নার বাবা পা ভেঙ্গে আজ শয্যাশায়ী, মা হৃদরোগে ভুগছেন। তামান্নার অনেক স্বপ্ন ছিল সে তার পরিবারকে দুঃখ-দারিদ্রের উর্ধ্বে রেখে পরিবারকে স্বচ্ছলতা এনে দিবে। কিন্তু তার সে স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। স্বপ্নকথাগুলো মাঝে মাঝেই গল্প না গেঁথে স্বপ্নলোকেই থেকে যায়, হারিয়ে ফেলে আবেগ।

আমরা এইটুকু আশা করি ব্যাবিলন গ্রুপের শিক্ষাবৃত্তির জন্য বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই মেধাকে জয় করে সফল হোক ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হোক। শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে যেসব শিক্ষার্থী মুকুলেই ঝরে পড়ছে তাদের পাশে এসে দাঁড়াক স্বপ্নলোকের কথাগুলোকে সত্য গল্পে গেঁথে রাখার জন্য। সর্বোপরি তারা ভালো মানুষ হোক, ভালোভাবে সমাজের একটি অংশ হয়ে বেঁচে থাক।

# আমি-ই আমার

মোঃ সাহিদুজ্জামান (শুভ)
জুনিয়র অফিসার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

জীবনের নদীতে কতবার ডুবেছি...
যাইনি তবুও তলিয়ে।
ঐ জলে সাঁতরিয়ে ঠিকমতো এসেছি ফিরে।
আধমরা নিঃশ্বাসে জীবনের ধকল খুবটা এসেছি ছাড়িয়ে।
সামনের ঐ পথটা বহুদূরের– যেতে চাই তবু সবটা পেরিয়ে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসের প্রত্যাশা সাফল্য...
নিতে চাই-ই ছিনিয়ে।
আমার আমিত্বে পেতে চাই সেই
মধু শুভক্ষণে জড়িয়ে...।

# শহীদ মেজর নাজমুল হক

(৭নং সেক্টর কমান্ডার)

ডাঃ মোঃ মোজাহারুল হক
মেডিক্যাল অফিসার
বাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

একদিন পড়ন্ত বিকেলে
ছদ্মবেশে তুমি এসেছিলে,
শত্রুর দিন নিলে আমাদের
সীমান্তের ওপারে।
যুদ্ধযুক্তি না হওয়ার তরে
মোরা ফিরে এলাম সাপাহার বাজারে।
সকালবেলা হাটশাওল ইপিআর ক্যাম্পে পৌঁছিলাম,
তারপর তোমার নিকট ট্রেনিং শুরু করলাম।
ব্রেকি-এ্যাম্বুশ-শুটিং সবই শেখালে,
ট্রেনিংয়ে সবাই ব্যস্ত সকালে বিকালে।
তথা হতে আবার যাত্রা শুরু সীমান্তের ওপারে পারিলায়,
শুরু হলো আবার ট্রেনিং তথায়।
পেরিলা ট্রেনিংয়ে বেছে বেছে ছাত্রলীগের ছেলে নিলো,
পারিলা হতে জলপাইগুড়ি- প্লেনে করে আসামে পাঠাল।
ট্রেনিং শেষে ঢুকলাম মোরা বাংলাদেশের ভিতরে,
পেরিলা প্রশিক্ষণ শুরু করলাম ঘরে ঘরে।
৭নং সেক্টর কমান্ডার তুমি হয়েছ,
শিলিগুড়ি মিটিং শেষে ফেরার পথে
রোড এক্সিডেন্টে চিরতরে বিদায় নিয়েছ।
এরপর তোমার আর কোনো খোঁজ পাইনি,
সোনা মসজিদ গিয়ে অঝোরে কেঁদেছি
দেখে তোমার কবরখানি।
শেষে আল্লাহর কাছে করি প্রার্থনা-
জান্নাতুল ফেরদৌস হয় যেন তোমার ঠিকানা।

# কল্পনায় তুমি

মোঃ ফরহাদ হোসেন নির্জন
অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ডাইজার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

১১

একদিন খুঁজেছিলাম যারে,
অজস্র বেদনার গোধূলী আঁধারে,
বেদনার মালতিলতায়, দুঃখের কদমতলে নিঝুম রাতে।
যাকে খুঁজেছি শরতের সকালে,
হৃদয় মন্দিরে, ব্যথার শিহরণে।
সেতো নিশিথের ছায়া কুহেলিকা হয়ে,
নীহারিকার মতো ভোরের সূর্যে গেছে মিলিয়ে।

তাই,
রাত্রীর নির্জনে যাত্রী হয়ে,
পাতাঝরা আধাঁরে, একা দাঁড়িয়ে।
বেদনার উলঙ্গ উল্লাসে অস্তমিত জীবনের অধ্যায়
আজ অনল ব্যথায় জর্জরিত।

এমনি এক নিয়তির ঢেউয়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবে,
কারণে অকারণে স্তব্ধ আর নীরব হয়ে যাই প্রায়ই।
এখন আর কষ্ট আমাকে কাঁদায় না নতুন করে,
অশ্রুর সাগর শুকিয়ে গেছে বলে
হয়তো আর টের পাই না।
বারবার একই ঠিকানায় ডাক পৌঁছাতে পৌঁছাতে,
কষ্টের ডাকপিয়নকেও আজকাল বড় ক্লান্ত দেখায়।

একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে
আকুতির অন্তিম অনলে পুড়তে পুড়তে
কৃষ্ণ গহ্বরে বিলীন হয় সবই;
রয়ে গেছে শুধু ছাইটুকু।

এ কেমন জীবন আমার!
এ কেমন বেঁচে থাকা!
কিছু স্বপ্ন কিছু বাস্তবতা
মাঝখানে তুমিহীন শূন্যতা,

তোমায় নিয়ে বিবিধ ভাবনাগুলো
কেন পুষ্পিত হয় না বাস্তবতায়?
একাকী নির্জন নিঃসঙ্গতা বুকে জড়িয়ে
শুধু বিরামহীন ক্লান্তিতে তোমায় খুঁজে ফেরা।

আমি খুঁজে ফিরি তোমায়
অসীম অন্ধকারে,
বহুদূরে হেঁটে এসে ক্লান্ত নয়নে
দিগন্ত শেষে গহীন অরণ্যে।
কখনো সত্যে কখনো স্বপ্নে
নীরব কবিত্বে, কখনো উচ্চারণের চিৎকারে।

আমি খুঁজে ফিরি তোমায়
মরুভূমির বুকে হাহাকার শূন্যতায়
রৌদ্রের খরতাপে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা
লেলিহান শিখায়।
তোমাকে খুঁজতে গিয়ে কালবৈশাখী ঝড়ের
মাতাল হাওয়ায় উন্মাদ ছিলাম আমি,
সবই ছিল অর্থহীন মূঢ়তা।

তোমার প্রতীক্ষায় সুদূর স্বপ্নে, ধূসর মগ্নতা
প্রলয় নিশ্চিত।
এতে কিছুমাত্র আক্ষেপ নেই আমার,
কারণ আমি জানি–
ভেজা মেঘের ওপারে
ঘননীল আকাশের পার্থিব শূন্যতায়
মিলিয়ে যাবার অপার্থিব আকাঙ্খায়
প্রতীক্ষারত আমার সত্ত্বা,
শুধু তোমার অপেক্ষায়।

প্রত্যাশা একটাই– তুমি
আর তোমার ভালোবাসার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা,
তোমার ইচ্ছার সাথে নিজেকে মিলানোর
সুতীব্র আকাঙ্খা
খেলা করে আমার প্রতিটি ভাবনার মাঝে।

এখন অনেক রাত
নীরব গভীর, নিস্তব্ধ চারদিক-
জোনাকিরা নিভে গেছে
জেগে আছে আমার স্বপ্নহীন আঁখি;
আর জেগে আছে
নিদ্রাহীন পরাজিত পাখি।
আজ স্বপ্নের চোখে অনিদ্রা
বিষণ্নতা ছুঁয়ে যায় মনের আনাচে-কানাচে,
পৌষের হিমেল হাওয়া বয়ে আনে বিষণ্নতা।
ক্লান্তিতে ছেয়ে যায় সমস্ত জীবন
বিষণ্ন আকাশে মেঘ জমে থাকে অনবরত।
সাজাতে পারি না বিবর্ণ রংয়ে নিজেকে।
কখনো বিষণ্ন মুহূর্তের উদ্বিগ্নতা
জীবনে ভূষিত হয় বর্ণহীন এক উপমায়;
কখনো বা আবেগের বন্যা প্লাবিত হয়
সমস্ত সত্ত্বায়।
তবুও বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা তুমি
আর তোমায় নিয়ে দেখা আমার স্বপ্নগুলো
হৃদয় পূর্ণতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে–
এই তো জীবন।

# মৃদু ছোঁয়া

আন্না হাসান
অফিসার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

তুমি এসেছিলে একগুচ্ছ কদম হাতে–
দিয়েছিলে আমার হাতে তুলে
আর বলেছিলে সমগ্র সুখ তোমায় দিলাম।
সেই বরষা থামার আগেই
সেই কদম শুকানোর আগেই
পিছু ফিরে দেখি তুমি নেই...
চলেই যদি যাবে
তবে কেন এসেছিলে?

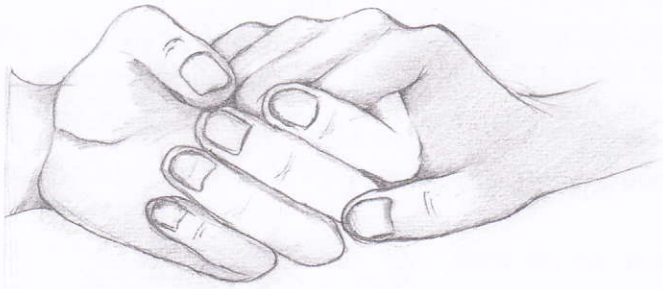

কেনই বা সমুদ্রসম আশা বাঁধিয়েছিলে?
কেনই বা মরুভূমির বুকে উৎসারিত করেছিলে জল?
মন মানতে চায় না, মানতেই চায় না-
আষাঢ়ের কালো মেঘের মতন
তুমিও আমার জীবনে হালকা ঝড়ো হাওয়া মাত্র।
কেন জানি এখনো আষাঢ়ের অপেক্ষায় থাকি,
কেন জানি অপেক্ষায় থাকি কখন কদম ফুটবে;
কেন জানি...

# মা

আম্বিয়া
জেনারেল অপারেটর, সুইং
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

মা আমার চোখের মনি
দুই নয়নের আলো,
মাকে ছাড়া একটি দিনও
যায় না আমার ভালো।

মা ডাকলে বুকের ভিতর
অন্যরকম দোল,
ঝড় তুফানে সুখে দুঃখে
শ্রেষ্ঠ মায়ের কোল।

মা আমার জীবন মরণ
আঁধার ঘরের আলো,
মাকে ছাড়া
জীবন আমার ভীষণ আঁধার কালো।

# সুপ্ত ব্যথা

আব্দুর রউফ
প্যাকিং ম্যান, ফিনিশিং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

হাসির মাঝে কান্না আছে
দেখে নাতো কেউ,
শুধুই মনে বইছে আমার
সুপ্ত ব্যথার ঢেউ।

সদাই থাকি হাসিখুশি
লোকে দেখে তাই,
বলে সবে আমার মতো
সুখি কেহ নাই।

আসলেই কি সুখি আমি?
নাকি জনম দুখি,
আসল কথা কেউ জানে না
জানে অন্তর্যামী।

# হারানো সেই দিন

হাবিবুর রহমান হাবিব
অপারেটর, সুইং
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

অই যে আমার কিশোরবেলার
ছোট্ট স্মৃতির নদী,
মনে হয় আবার আমি
ছোট হতাম যদি।

অই যে আমার সোনার মতো
ছোট্ট স্মৃতির গাঁ,
আম-কাঁঠালের সবুজ ছায়ে
আর কি যাবো না?

কাল ওখানে আলো ছিল
আজ আঁধারে ভরা,
তাইতো আমি আপন মনে
লিখি দুঃখের ছড়া।

কোথায় গেল হারিয়ে মাগো
সুখের সেসব দিন,
আর কি তোমায় পাব ফিরে
আমরা কোনোদিন?

# আতঙ্কের দিনগুলো

উম্মে সালমা ডালিয়া
ম্যানেজার, প্যাটার্ন
বাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আমরা ভালো নেই, খুবই আতঙ্কে আছি। কখন আবার কী ঘটে সেই আতঙ্কে। বলছিলাম অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আমার দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা। সেদিন পহেলা জুলাই শুক্রবার দিন তারাবির নামাজ শেষ করে বসেছি এমন সময়ে আমার এক ভাবি ফোন করেছে, তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। ঠিক তখনি আমার বড় ছেলে এসে বলল, মামনি বাংলাদেশের চ্যানেলে কীসব দেখাচ্ছে, গুলশানে গোলাগুলি হচ্ছে, তাড়াতাড়ি দেখ। আমি প্রথমটায় ঠিক আত্মস্থ হতে না পেরে ভাবীর থেকে বিদায় নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দিলাম। দ্রুত টিভি অন করে বাংলাদেশি চ্যানেলে দিলাম এবং দেখলাম কথা সত্যি। আসলেই গুলশানে হলি আর্টিজান নামে একটা রেস্টুরেন্টে কিছু স্বশস্ত্র লোক এ্যাটাক করেছে। দেশি-বিদেশি কিছু লোক সেখানে আটকা পড়েছে। প্রায় সবগুলো টিভি চ্যানেলেই লাইভ দেখাচ্ছিল কিন্তু আমি টিভি অন করার অল্প কিছু সময় পরেই লাইভ দেখানো বন্ধ করে দিলো পুলিশের কমকর্তারা। এরই মধ্যে জানা গেল পুলিশের দুইজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন এবং আরও অসংখ্য পুলিশ আহত হয়েছেন আক্রমণকারীদের ছোড়া বোমার আঘাতে। আমি আর বেশিক্ষণ এই খবর দেখতে পারছিলাম না, তাই টেলিভিশন বন্ধ করে দিলাম। রমজান মাস এবং একটু পরেই সেহেরির জন্য উঠতে হবে, তাই ছেলেদেরকে শুয়ে পড়তে বলে আমিও ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

যথাসময়ে সেহেরির জন্য উঠে দরজা খুলতেই দেখলাম ছেলেদের ঘরের দরজা খোলা। ওরা টিভি সেটের সামনে বসা। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করতেই ওরা বলল, সারারাত ওরা বিছানায় শোয়নি, টিভির সামনেই বসেছিল। বাংলাদেশের সব চ্যানেলে লাইভ দেখানো বন্ধ করে দেয়ার পর ওরা বিবিসি ও আল্‌জাজিরা টিভিতে অনেক কিছুই দেখেছে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শির সাক্ষাৎকার দেখেছে। আমার বড় ছেলে বলল মা, ওখানে প্রায় সবাইকেই গলা কেটে মেরে ফেলেছে। ওরা সেইসব চ্যানেল থেকে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও কিছু লোমহর্ষক বর্ণনা দিচ্ছিল আমাকে। সে রাতে আমি আর কিছুই মুখে তুলতে পারলাম না।

পরের দিন অফিসে এসে আরও বিস্তারিত শুনতে পারলাম কলিগদের কাছ থেকে। সকাল ৮টার দিকে আর্মিদের অভিযানে এই জঙ্গি অবরোধের অবসান ঘটে, যারা এটার নেতৃত্বে ছিল তারা সবাই নিহত হয়। এই দিন ছিল ২৬শে রমজান। দিন শেষেই পবিত্র শব-ই-কদরের রাত। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই আমাদের সবচেয়ে কাঙ্খিত ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। কিন্তু আমাদের বাসার কাউকেই এই ঈদের আনন্দ স্পর্শ করতে পারছে না। আমার মনে হয় বাংলাদেশের সব মানুষেরই মনের অবস্থা এই রকম ছিল সে সময়।

তবে তখন যারা ঢাকায় অবস্থান করছিলেন তারা সবচেয়ে বেশি অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। সাধারণত কদরের রাতে আমার ছেলেরা এবং তাদের বাবা গভীর রাত পর্যন্ত নামাজ পড়ে মসজিদে এবং এরপর ওদের দাদা-দাদির কবর জিয়ারত করেই বাসায় ফেরে। কিন্তু এবার আর আমি ওদেরকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকার অনুমতি দেইনি। কারণ যেসব ছেলেরা এসব নির্মম হত্যাকান্ড ঘটাল প্রায় তাদেরই বয়সী আমার ছেলেরা। ভীষণ আতঙ্ক লাগত, মনে হতো আমার ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে যাবে না তো। কারণ সে সময় প্রশাসনের লোক ওদের বয়সী ছেলেদেরকে বেশি বেশি নজরে রাখত এবং ধরেও নিয়ে যেত।

সাধারণত যারা দেশের বাড়িতে ঈদ উদযাপন করে তারা সবাই চলে যায় ঈদের দুই দিন আগে এবং ঢাকা শহর একদম ফাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু এ বছর সরকারি এবং বেসরকারি অফিসগুলো কয়েকদিন আগেই ছুটি হয়ে যাওয়ার ফলে তখন ঢাকা শহর ছিল ফাঁকা। মুক্তিযুদ্ধ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি কিন্তু ঐ কয়েকটা দিন যেরকম আতংকে ছিলাম তাতে যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের মানুষেরা কীভাবে কাটিয়েছে তা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি।

আমরা সাধারণত ঈদের কেনাকাটা শুরু করি ২৭শে রমজান থেকে, কারণ ছেলেরা ২৬শের রাতে খতম তারাবিহ পড়ে, তবেই যায়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আর আমাদের সেভাবে কেনাকাটা হলো না। আমার জীবনে অনেক দুঃখ, কষ্ট এবং অনেক আনন্দের ঈদ কেটেছে, কিন্তু এরকম আতঙ্কিত ঈদ আর আমি দেখিনি। সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে বসেছিলাম। বাচ্চাদেরকেও বাইরে যেতে দেইনি। এমন আতঙ্কে কি ভালো থাকা যায়? ঈদের দিন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদ জামাত হয় শোলাকিয়াতে এবং এই নামাজ কয়েকটি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করে তাই আমিও বসে থাকি টিভির সামনে মুনাজাতে শরীক হবার জন্য। কিন্তু অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে দেখলাম সেখানেও জঙ্গি হামলা হয়েছে, পুলিশসহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। আমরা আরও আতঙ্কিত হলাম। বন্ধের কয়েকটা দিন যেন আর ফুরাতেই চায় না। যখন যেখানেই থাকি কিছুক্ষণ পর পর বাচ্চাদের খোঁজ নেই ওরা কোথায় এবং কেমন আছে। একদিন আমার বড় ছেলের ইউনিভার্সিটি থেকে ফোন করেছে। আমাকে ফোনের ওপাশ থেকে আমার ছেলের নাম ধরে বলল, আপনি কি ওর মা? সাথে সাথেই আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম, ওর কোনো সমস্যা হয়নি তো? বেশ কয়েক সেকেন্ড আমি কথাই বলতে পারছিলাম না। এরপরে জানলাম আসলে ছেলের নাম্বারটা বন্ধ পাচ্ছিল বলে উনারা ওর একটা ইন্টারভিউয়ের তারিখ এবং সময় আমাকে জানানোর জন্য ফোন করেছে।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এত কষ্ট করে বড় করে তোলা প্রাণের থেকে প্রিয় এই ছেলেগুলো কেন জঙ্গিবাদের মতো এই জঘন্য চক্রের সাথে যুক্ত হচ্ছে? কীভাবে হচ্ছে?

পরিবারের লোক কেন বুঝতে পারছে না যে তাদের ছেলেটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদেরকে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে তাদের কাছের লোক। যেমন, মা, বাবা, ভাই, বোন। বিশেষ করে মায়েরা সব থেকে আগে টের পান বাচ্চাদের মনের অবস্থা বা পরিবর্তন। খুব ছোট সময় থেকেই বাচ্চাদের স্বভাবের দিকে বাবা-মায়ের খেয়াল রাখা উচিত। ইদানিংকালের বাচ্চারা ইন্টারনেটের কল্যাণে আর আগেকার মতো মাঠে গিয়ে খেলা করে না। তারা গেইম খেলে কম্পিউটার বা মোবাইলে এবং এসব নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যস্ত থাকে। যাদের বাসায় কম্পিউটার নেই তারা বাইরে বিভিন্ন ভিডিও গেমের দোকানে যেয়ে টাকার বিনিময়ে গেম খেলে, অনেকে টিফিনের টাকা দিয়ে খেলে এবং অনেকে স্কুল ফাঁকি দিয়েও খেলে। বাসার কেউ খোঁজ না নিলে জানতেও পারবে না যে তাদের বাচ্চা স্কুল ফাঁকি দিয়ে ভিডিও গেমস খেলছে। কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে একটা প্রতিবেদন দেখলাম এই ভিডিও গেমের সম্পর্কে।

আসলে আমাদের দেশে এত বড় জঙ্গি হামলার ঘটনায় দেশের সবাই কম বেশি ভাবছি, কি করে এই সমস্যা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। আমাদের দেশের টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলেও এটার উপর বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এরকমই একটি প্রতিবেদনে দেখাচ্ছিল যে, আজকাল বাচ্চারা কী ধরনের ভিডিও গেমস খেলে। তাতে যা দেখা গেল প্রায় সবাই মানুষ খুন, মারামারি, কাটাকাটি এবং কীভাবে আইন ভঙ্গ করে গাড়ি বা অন্যের সম্পত্তি কেড়ে নেয়া যায় এই ধরনের খেলা খেলে। কীভাবে মানুষ খুন করে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে হয় সেটাই খেলার মূল আকর্ষণ এবং যে যত বেশি এসব করতে পারবে, সে তত বেশি পয়েন্ট পাবে। এই প্রতিবেদকের ভাষ্যমতে, এইসব কোমলমতি বাচ্চারা এই ধরনের বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর খেলা থেকেই জঙ্গিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আমার মতে এটা অনেক কারণের মধ্যে একটা। এছাড়াও আরও আছে সামাজিক, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক, যা কিনা আমরা নিজেরাও ভালোভাবে বুঝি না। আসলে অভিভাবক থেকে শুরু করে সমাজের সবাইকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন আর কারও সন্তান জঙ্গিবাদের সাথে জড়িয়ে না পড়ে। কোনো বাবা-মাই চান না তার সন্তান খারাপ পথে চলুক, বিপথে যাক। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে একটা সুন্দর সমাজ গড়ি এবং এরই সাথে সাথে আমাদের দেশটিকেও সুন্দর করে গড়ে তুলি।

# মুক্তি

এ কে এম গোলাম মহহী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

১১

রবিন অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে। ওর হাতের ডিজিটাল ওয়াচে টাইম এখন দশটা বেজে পঞ্চান্ন। কলেজে ক্লাস শুরু হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে। অথচ হেঁটে কলেজে পৌঁছাতে হলে ওর এখনও ন্যূনতম পনের মিনিট সময় প্রয়োজন।

আচমকা সে ঘড়ি দেখল। মাই গুডনেস– অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে প্রায় দৌড়াতে শুরু করল ও। কলেজের গেট দিয়ে ঢুকে ক্লাসের সামনে এসে যখন ও পৌঁছল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা নিয়ে ও ক্লাসের দরজায় দাঁড়াল। ভেতরে অগ্নিদৃষ্টি ধারণ করে একজন লোক তার দিকে তাকালেন। এর নাম অগ্নিদৃষ্টি বললে ভুল হবে। রবিন নিশ্চিত এ দৃষ্টির ভেদন ক্ষমতা গামা রশ্মির চেয়েও বেশি। হৃদপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়।

যিনি তাকিয়ে আছেন তার নাম আরিফ স্যার। এই কলেজের কেমিস্ট্রি টিচার। খুবই কঠোর স্যার। ক্লাসের ভেতরে বহু জোড়া চোখ বেশ আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আরিফ স্যার এখন যাচ্ছেতাইভাবে তাকে গালমন্দ করবেন। যত গালমন্দ করবেন ততই মজা পাবে সে চোখগুলো। আরিফ স্যার শুরু করলেন, এই ছেলে তোমার নাম কী? স্যার, রবিন। রবিনের গলা শুকিয়ে প্রায় কাঠ। তুমি ঘড়ি দেখে বলো, কতক্ষণ লেট করেছ? দশ মিনিট আঠার সেকেন্ড স্যার। কথাটা বলেই ও বুঝতে পারল, সেকেন্ড বলাটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। যে সেকেন্ডের হিসাব করে, সে লেট করে না।

আরিফ স্যার গামা রশ্মিয়ো দৃষ্টি দিয়ে আর একবার তার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, তাহলে আগামী বিশ মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড ওখানেই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো।

আমি স্টপওয়াচ চালু করছি।

ক্লাসের সবাই স্যারের বলার ভঙ্গি শুনে হো হো করে হেসে উঠল। রবিন নীরবে কান ধরল। কলেজেও যে স্যাররা কতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আরিফ স্যার। ক্লাসের ভেতরে চাপা হাসির শব্দ, গুন গুন কথা শোনা যেতে শুরু করল। বেশি হাসতে শুরু করল মেয়েরা। সেদিকে খেয়াল নেই রবিনের। ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কেয়ার করে না ও। কদিনইবা ওদের সাথে পরিচয় থাকবে ওর। আর দুমাস পরেই এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। তারপর কে কাকে চিনবে! ওর ভয় অন্যখানে। ফার্স্টইয়ারের কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে রক্ষে নেই। নিঃসন্দেহে এ খবর লায়লার কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর যখনই ও লায়লার সামনে পড়বে, মেয়েটা একটা চাপা হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকাবে! এমনটা আগেও হয়েছে। যেদিন ক্লাসে পড়া না পারার জন্য কিংবা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে টেস্টটিউব ভেঙে ফেলার জন্য স্যারের বকুনি শুনেছে, কোনো না কোনোভাবে সে খবর লায়লার কানে পৌঁছে গেছে। তারপর যখনই ও লায়লার সামনে পড়েছে তার সেই বিখ্যাত পিত্তি জ্বালানো হাসি দেখতে হয়েছে। ও শিওর আজও এর ব্যতিক্রম হবে না।

অন্যদিন হলে এ নিয়ে হয়তো অনেক টেনশন করতে হতো ওকে। আজ সেদিকে তার মন নেই। একটা অন্যমনস্কতা তাকে পেয়ে বসেছে। কানে হাত দিয়েই ও বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকাল। কেমন একটা উন্মত্ত বাতাস বইতে শুরু করেছে গত কয়েকদিন থেকে। এ এক অদ্ভুত বাতাস, মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। ইচ্ছে করে ঘুড়ি হয়ে সে বাতাসে গা ভাসিয়ে দিতে, কিন্তু সম্ভব না। ঘুড়ি অভিকর্ষকে ফাঁকি দিতে পারে, মানুষ পারে না।

কানে ধরা অবস্থায় পনের মিনিট পার হবার পর স্যারের দয়া হলো। ভেতরে গিয়ে বসতে বললেন। একদম শেষের খালি বেঞ্চটায় গিয়ে বসল রবিন। কারো সাথে বসলে এখন অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তার চেয়ে একা বসাই ভালো।

বাকি ক্লাসগুলোতে সে এক মিনিটের জন্যও মনোযোগ দিতে পারল না। কেবলই আজ সকালের ঘটনাটা ফ্ল্যাশব্যাক হতে লাগল। ঘটনাটা ঘটেছে আজ খুব সকালে। রবিনকে খুব সকালে স্যারের বাসায় যেতে হয়। সামনে এইচএসসি পরীক্ষা বলে ওকে ইংরেজি আর সাইন্সের সাবজেক্টগুলো পুরোদমে দেখতে হচ্ছে। সকালে রায়হান স্যারের বাসায় সাইন্সের সাবজেক্টগুলো পড়ে সন্ধ্যায় কবির স্যারের বাসায় ইংরেজি। অন্য আর দিনগুলোর মতোই আজ সকালে বাসা থেকে রায়হান স্যারের বাসার উদ্দেশে বের হয়ে যায় সে। এখনও পুরোপুরি সূর্য ওঠেনি। ওর বাসা থেকে রায়হান স্যারের বাসায় পৌঁছতে প্রায় পঁচিশ মিনিট সময় লাগে। সকালে আকাশটা কেমন যেন ফ্যাকাশে ছিল। মনটাও ভালো ছিল না। মন খারাপ থাকার কারণ খুব বড় কিছু না। ওর ইয়ারফোনটা নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ এ মাসেই ইয়ারফোনটা কেনা হয়েছিল। মাকে এ মাসেই আর একটা ইয়ারফোন কিনে দেবার কথা

ভুলেও বলা যাবে না। এমনি মাকে অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাবা মারা যাওয়ার আগে মা খুব হাসিখুশি ছিল। বাবা মারা যাবার পর পুরোপুরি বদলে গেছে মা। এসব ভাবতে ভাবতে আনমনে হাঁটছিল ও।

মিনিট দশেক হাঁটার পর মোড় নিয়ে বিসিকের গলিটায় ঢুকল ও। এটা একটা শর্টকাট। এ গলি ওর প্রায় আট মিনিট সময় সেভ করে। গলিটায় মানুষের যাতায়াত খুব একটা হয় না। আজ গলিতে কোনো মানুষই ছিল না। গলিটায় মিনিটখানেক হাঁটার পর রবিন এমন একটা দৃশ্য দেখল যাতে সে শিউরে উঠল। রাস্তার ডান পাশে একটা রক্তাক্ত লাশ চিত হয়ে পড়ে আছে। কী বিচ্ছিরি দৃশ্য! লাশটার মুখটা হা হয়ে আছে। মৃতদেহের পেটে আর কানের কাছে দুটো গুলির দাগ। চোখ দুটো খোলা। একটা নিথর চাহনি সে চোখে। রবিন স্তম্ভিত হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তার কমনসেন্স কাজ করছিল না হয়তো। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেয়ে চারপাশটায় তাকাল ও । একদম জনমানবশূন্য। দ্রুত রাস্তাটা পার হয়ে যাবে ঠিক করল ও। মৃতদেহটা অতিক্রম করে কয়েক কদম এগিয়ে গেল সে। তারপর অজান্তেই থামল সে। একটা অজানা আকর্ষণ তাকে পিছু ফিরে তাকাতে বাধ্য করল। যে দৃশ্য তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল তা এবার চোখে পড়ল। লাশটার ডানপাশে দেয়ালের গোড়ায় একটা রিভলবার পড়ে আছে। মরে যাবার আগে হয়তো অস্ত্রটা এই লোকটির হাতেই ছিল। কিন্তু এখন এর ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

রবিন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেল। একটা অজানা শক্তি তাকে লাশটার কাছে নিয়ে গেল। শেষবারের মতো চারপাশে তাকাল সে। আগের মতোই সুনসান নীরবতা। চোখের পলকে রিভলবারটা তুলে নিল ও। চালান করে দিল ব্যাগের ভেতরে। তারপর দৌড়াতে শুরু করল সে। কতক্ষণ এমন ঘোরের মাঝে দৌড়াল ঠিক মনে নেই, যখন ঘোর কাটল, দেখল সে বাসস্ট্যান্ডের সামনে। যাত্রী ছাউনিতে থ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ও। খুব দুর্বল লাগতে শুরু করল নিজেকে। কেমন একটা পাপবোধ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

রায়হান স্যারের বাসায় যাওয়া হলো না। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় ফিরল ও। অসময়ের বৃষ্টি। এরপর থেকে একটা অন্যমনস্কতা ওকে চেপে ধরে আছে। কী করা উচিত ওর? রিভলবারটা ভয়ানক পরিণতি আনতে পারে ওর জীবনে। কেউ জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভয় আর বিষাদ মেশানো একটা অনুভূতি সব সময় তাড়া করে ফিরছে ওকে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর। কলেজে ছুটির বেল বেজে উঠল। ভাবনায় ছেদ পড়ল ওর।

কলেজের গলি পার হয়ে মেইন রোডে ওঠার পথটায় যে বাঁকটা সেখানে একটা লাইব্রেরি আছে। নাম কুমিল্লা লাইব্রেরি। লাইব্রেরির সত্বাধিকারী রহমান মুন্সি। সারাক্ষণ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে দোকানের এ মাথা থেকে ও মাথায় হাঁটাহাঁটি করেন।

রবিন লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কয়েকটা বই নাড়াচাড়া করছে সে। দেখে মনে হচ্ছে সে বই কেনার ব্যাপারে সিরিয়াস, আসলে তা না। সে অপেক্ষা করছে কখন সাড়ে চারটা বাজবে। সাড়ে চারটায় লায়লাদের ছুটি হবে। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লায়লা আর কয়েকজন বান্ধবী নিয়ে এদিক দিয়ে যাবে। শুধু আড়চোখে ওকে কয়েকবার দেখবে। ওর বান্ধবীরা আরো তীক্ষ্ম বিরক্তিকরভাবে ওর দিকে তাকাবে। অকারণে হাসাহাসি করবে। সিগারেট জ্বলে যাবে রবিনের। নিজেকে কেমন বোকাবোকা লাগবে। এসবের কোনো মানে হয়? তবু কোনো এক অজানা কারণে এখানে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকে রবিন। না, কারণটা অজানা না, লায়লাকে এক পলক দেখার জন্য। লায়লা কি ব্যাপারটা বোঝে? হয়তো বোঝে না। যে কথা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট না সে কথা লায়লা কীভাবে বুঝবে!

অবশেষে লায়লার দেখা পাওয়া গেল। ওর বান্ধবীদের সাথে হেঁটে গেল সামনের রাস্তাটা ধরে। যাবার সময় বান্ধবীদের মধ্য থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 'শুনেছিস আজ নাকি কেউ একজন ঘন্টাখানিক কান ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।' অমনি সবার মধ্যে হাসির রোল পড়ল। রবিনের খুব রাগ হলো। লায়লার বান্ধবীগুলো যেমনই হোক লায়লা কিন্তু কখনোই এসব কথা নিয়ে কিছু বলে না। ও সব সময় চুপ থাকে। তবে মাঝে মাঝে মুখ চেপে হাসে। এই হাসি কি উপহাসের? কে জানে। কিছুটা এগুতেই রাস্তার মাথায় যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তাতে ও বাকশক্তিহীন হয়ে গেল। সেখানে মটর সাইকেলের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন যুবক। এলাকায় এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যা তারা করে না। সবাই জানে ওদের লিডার সেলিম। ওদের চোখ দেখে বলে দেয়া যায় এরা পেশাদার খুনি। স্বপন বিশ্রি ভঙ্গিতে লায়লাকে ডাকে, ওই ছেরি, শুইন্যা যা..

লায়লা থামে না, সে তার নিজস্ব গতিতে হাঁটতে থাকে, তার সাথে তার দুজন বান্ধবী।
স্বপন দ্রুত হেঁটে গিয়ে ওদের পথ রোধ করে এবং বলে, কিরে তোরে থামতে কইলাম, কথা কানে যায় না? ওই, তোমরা দুইজন যাওগা, তার সাথে আমার কথা আছে।
লায়লাকে দেখে অসম্ভব অসহায় মনে হলো। সে বলল, আমাকে যেতে দিন। আমার সাথে আপনার আবার কী কথা।
অনেক কথা আছে। শীঘ্রই তোমার মামুর কাছে আমি বিয়ার প্রস্তাব পাঠামু। তুমি না করবা না বুঝছ?
ছি, ছি, এসব কী বলছেন। আমাকে যেতে দিন।
লায়লার মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। বৃষ্টিতে কোনো দোয়েল পাখি ভিজে গেলে যেমন চুপসে যায় তাকে তেমন অসহায় দেখাচ্ছে। আজকের মতো স্বপন তাকে যেতে দিয়েছে। সে নীরবে বাসার পথে হাঁটতে থাকল।

রবিন কেমন অস্থির বোধ করতে শুরু করল। কয়েক মিনিট ওর পেছনে হাঁটার পর ওকে ডাকল। ও ভেবেছিল লায়লা ডাকে সাড়া দেবে না। কিন্তু লায়লা থামল। ও কোনো প্রসঙ্গ

ছাড়াই বলল, স্বপন তোমাকে কী বলেছে লায়লা?
লায়লা চুপ করে রইল। রবিন আবার জিজ্ঞেস করল, স্বপন তোমাকে কী বলেছে, লায়লা?
যা বলেছে বলুক, তা শুনে আপনার লাভ কী? লায়লার চোখমুখ শক্ত।
তুমি কি ওকে বিয়ে করবে?
আমার মামা জানে।
তোমার মামা যদি তোমাকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে ওকে বিয়ে করতে বলে, তুমি করবে?
লায়লা চুপ করে হাঁটতে শুরু করে। রবিনও পিছে পিছে হাঁটতে শুরু করে। সে আবার জিজ্ঞেস করে, জবাব দাও, তুমি লেখাপড়া বন্ধ করে স্বপনকে বিয়ে করবে?

এবার লায়লা দাঁড়াল, একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস নিয়ে নরম স্বরে বলল, রবিন ভাই আমার বাবা নেই, মা আর আমি মামার পরিবারে তার একান্ত দয়ায় বেঁচে আছি। তিনি যদি বলেন, একজন মাস্তানকে বিয়ে করতে আমি তাই করব। তবে ভালোবেসে করব না, মামাকে খুশি করতে করব।

কিন্তু...
কোনো কিন্তু না রবিন ভাই। আসলে আমাদের মতো মেয়েরা স্বপনদের হাতের পুতুল। আমাদের মুক্তি নেই।

লায়লার লাবন্যময় মুখটা খুব কাতর দেখাল। রবিন থেমে গেল। লায়লা দ্রুত পদে হেঁটে চলে গেল। সে পথে একটা অস্ফুট দুঃখ নিয়ে তাকিয়ে রইল রবিন। মনে মনে ভাবল, এক পশলা বৃষ্টি হলে ভালো হতো। ওর কান্না কারও চোখে পড়ত না।

সাত আটদিন পরের কথা। রবিন কলেজ গেটের সামনের চা দোকানটায় বসে আছে। এ কদিন ও কলেজে আসেনি। তবে প্রতিদিন চা দোকানটায় ছুটির সময় এসে বসে থেকেছে। অপেক্ষা করেছে লায়লা কখন বের হবে। লায়লা বের হয়নি। তবুও সে এখানে প্রতিদিন বসে থেকেছে। ওর চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। চোখ কোটরে বসে গেছে। চোখে একটা জ্বলজ্বল ভাব এসেছে।

আজ সাড়ে চারটা বাজতেই ঘন্টা বাজল কলেজের। লায়লা বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। ওর সাথে কোনো বান্ধবী নেই। চেহারায় লাবন্য নেই। প্রতিদিন যে পথে বাড়ি ফেরে আজ সে পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরল। কিছুদূর যেতেই একটা মাইক্রোবাস লায়লার পথ রোধ করল। স্বপন লায়লার সামনে দাঁড়াল। দাঁত মুখ খিঁচে বলল, ভেবেছিস আমাকে ফাঁকি দিবি, না? ওঠ গাড়িতে।
লায়লা অসহায়ের মতো বলল– ছাড়ুন, আমাকে যেতে দিন। আমি কিন্তু লোক ডাকব।
লায়লার মৃদু ডাকে সাড়া দেবার মতো সাহস সেখানে কারও ছিল না। স্বপন টেনে হিঁচড়ে

তাকে গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে শুরু করল। রবিন লায়লাকে অনুসরণ করছিল। লায়লাকে টেনে হিঁচড়ে নেবার দৃশ্যটা সে সহ্য করতে পারল না। বিদ্যুৎ গতিতে প্যান্টের পকেট থেকে কুড়িয়ে পাওয়া রিভলবারটা বের করল। দুম দুম করে দুবার ফায়ার করল। দুটা গুলি স্বপনের বুক ভেদ করে চলে গেল। লায়লাকে ছেড়ে দিয়ে স্বপন মাটিতে পড়ে গেল। স্বপনের অন্য সঙ্গীরা ঘটনার আকস্মিকতায় ওর মৃতপ্রায় দেহটা রেখেই গাড়ি নিয়ে ছুটে চলে গেল।

লায়লা বাকশূন্য হয়ে এক পলক রবিনের দিকে চেয়ে রইল। পরক্ষণেই চিৎকার করে বলে উঠল, এটা কী করলেন রবিন ভাই, এটা কী করলেন? দৌড়ে এসে সে রবিনের হাত থেকে রিভলবারটা ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল।

রবিন তখনও যেন কোনো ঘোরের মধ্যে আছে। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছিল। ও দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আজ আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম, লায়লা।

একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ তখনও চারপাশকে ঘিরে আছে। ঠান্ডা একটা হাওয়া রবিনের গা ছুঁয়ে বয়ে গেল। ওর মনে হলো, ও যেন ঘুড়ি হয়ে যাচ্ছে। অভিকর্ষকে ফাঁকি দিয়ে খুব নিঃশব্দে সে উপরে উঠে যাচ্ছে।

# সুখে থাক ভালোবাসা

মোঃ তানভীর হক সরকার
প্রাক্তন অফিসার, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

১১

সকালের নাস্তায় আমি কখনও ভারী কিছু খাই না। বিশেষ করে খিচুড়ি বা তেহারি জাতীয় কিছু। কিন্তু আজ অর্ডার দিতে হলো। আমার নিজের জন্য না, মিমির জন্য। সে নাকি পুরো একদিন না খেয়ে আছে। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় অনেক কিছু নিয়ে বের হয়েছে কিন্তু খাবার নিয়ে বের হয়নি। রাস্তায় কিছু খায়ও নি। ফলাফল না খেয়ে থাকা। মিমির খাওয়া দেখে নিজের খারাপ লাগল। মিমির জন্য নয় নিজের জন্য। খাওয়া শেষে বড় রকমের একটা বিল দিতে হবে। এ মাসের বেতন এখনও সপ্তাহখানেক দেরি। তার উপর মিমির এভাবে খেতে থাকা। এ মাসে অফিসের কোনো কলিগের কাছ থেকে ধার নিতে হবে।

একটা সেভেন আপ বা স্প্রাইট নেব?
নাও।
একটা মিস্টি পানের অর্ডার দেই।
নাহ্। সকাল সকাল পান ভালো লাগে না।
মেয়েটার চোখের দিকে আশ্চর্যভাবে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। দেখে মনেই হয় না বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। নেই কোনো টেনশন, নেই কোনো ক্লান্তি। সারারাত জার্নি করার পর কেউ কীভাবে এমন থাকতে পারে! বুঝলাম, বয়সের দোষ একেই বলে।

খাওয়া দাওয়া শেষে মিমিকে নিয়ে হোটেল থেকে বের হলাম। আমার এত সকালে উঠার অভ্যাস নেই। মিমি হুট করে ফোন করে বলল, আমি সাভারে, আমাকে নিয়ে যাও। সে এভাবে সাভারে এসে উপস্থিত হবে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি শুদ্ধ বাংলায় চিপায় ফেঁসে গেলাম।

আমরা এখন কোথায় যাবো?
দেখি।
আচ্ছা আমাকে কি তুমি তোমার বাসায় উঠাবে? আমি কিন্তু সাবলেট থাকতে পারব না- খানিকটা আহ্লাদি স্বরে বলল সে।

চলো তাহলে একটা বাসা ভাড়া করি। গুলশানে দেড় লাখ টাকায় বাসা ভাড়া পাওয়া যাবে। চলবে তোমার? মিমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। এটা আশা করেনি সে। আমি সেদিকে লক্ষ্য করলাম না।

আমরা এখন বসে আছি ফ্লেক্সিলোড কাম চায়ের দোকানের সামনে। দোকানে আমি আর মিমি। আমাদের সামনে ঢাকাগামী গাড়ি 'ইতিহাস' কাউন্টার। মিমি চায়ের দোকানে বসতে চায়নি, আমি বসতে বলায় বসেছে। আমি অপেক্ষা করছি দুইটা ফোন দেয়ার জন্য। ফোনগুলো না দিলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। প্রথম বিপদটা আমার, পরেরটা মিমির। মিমির বিপদটা অনেক বড়। সে নিজেও জানে না যে সে কী করে ফেলেছে। সে এখনো বুঝতে পারছে না সে কী করতে যাচ্ছে। প্রথম ফোনটা দিলাম অফিসে। মিথ্যে অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিয়ে নিলাম। এবার পরের ফোন দেওয়ার পালা। চায়ের দোকানের মালিক এক রোগা পাতলা বালক। চা বানানোর সময় চামচ আর কাপের টুং টাং শব্দ শুনতে ভালো লাগছে।

মিমি!

হ্যাঁ, বলো।

তোমার বাবার নাম্বারটা দাও, ফোন করব।

আব্বাকে ফোন করবে কেন?

তাকে ফোন করে বলব যে তার মেয়ে ভালো আছে। একটু পরে সে রংপুরের বাসে উঠে চলে আসবে।

মানে?

মানে পরে বলি। নাম্বারটা দাও।

মিমি নাম্বারটা দিলো। নাম্বার দিতে দিতে সে কান্না শুরু করে দিলো। চায়ের দোকানে এমন দৃশ্য বিরল। সবাই চা খাওয়া বাদ দিয়ে মিমির কান্না দেখতে লাগল। রোগা চায়ের দোকানের মালিক তার টুং টাং শব্দ থামিয়ে দিয়েছে। আমি মিমির বাবাকে ফোন দিলাম। সাথে সাথে মোবাইল রিসিভ হলো।

হ্যালো, কে বলছেন?

আমি তামিম বলছি।

কোন তামিম?

আপনার মেয়ে যার জন্য ঢাকায় এসেছে।

ওপার থেকে কোনো শব্দ আসছে না। মিমির কান্নার গতি বেড়ে গেছে। ওকে দোকানে রেখে একটু দূরে চলে এলাম।

হ্যালো, আপনি মিমির বাবা বলছেন? কিছু বলছেন না কেন?
ও ঢাকায় চলে গেছে মানে?
ঢাকায় চলে গেছে মানে ঢাকায় চলে গেছে। সে এই মুহূর্তে ঢাকা উনিশ আসনে খুঁটি গেড়েছে।
এই তুই কী বলছিস, ঠিক করে বল।
সাভারকে ঢাকা উনিশ আসনের আন্ডারে ফেলা হয়েছে। এখানকার এমপির নাম ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান। তিনি এনাম মেডিকেল অ্যান্ড হসপিটালের মালিক। রানা প্লাজায়.....
এই কু... বাচ্চা চুপ।
কথাটা শেষ করি। রানা প্লাজা ধ্বসে পড়ার পর তার হাসপাতাল পুরো সিচুয়েশন ট্যাকেল দিয়েছিল। সেই কাজের পুরস্কার পেলেন এমপি হয়ে।
এই তুই কী চাস? তুই কী চাস?
আমি চাই আপনি মিমিকে ক্ষমা করে দিন। ও এখন গাড়িতে উঠে যাবে। রাতের মধ্যে রংপুর চলে যাবে। ও রংপুর চলে গেলে আপনি ভালো ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দিবেন।

ওপাশ থেকে কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। আমিও আর কথা বললাম না। ফোন রেখে দিলাম।
দোকানে ঢুকে দেখলাম মিমি ভেজা ভেজা চোখে চা খাচ্ছে। কপালে ঘামের জন্য কয়েক জোড়া চুল লেপ্টে আছে। এই প্রথম মিমিকে দেখে মনে হলো, মেয়েটা খুব সুন্দর। একমাত্র কপালে লেপ্টে থাকা জোড়া চুল যে মেয়েদের সুন্দর করে তোলে তারাই প্রকৃত সুন্দর। তার উপর ভেজা চোখে চা খাবার দৃশ্য তাকে আরও অসাধারণ করে তুলেছে।

মিমিকে নিয়ে দিনাজপুর বাস কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছি। কাউন্টার এখনো খোলেনি। পকেটে যে টাকা আছে তাতে মিমির টিকিটের টাকাটা হয়ে যাবে। হাজার হোক তার কাছে তো আর টিকিটের টাকা চাইতে পারি না।

তুমি আমাকে সত্যি সত্যি রংপুর পাঠিয়ে দেবে?
হুম।
আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম?
এখন পর্যন্ত করোনি তবে তুমি থেকে গেলে ক্ষতি হয়ে যাবে।
কিসের ক্ষতি? তোমার কথার আগামাথা কিছুই বুঝছি না।
না বুঝাই স্বাভাবিক।
এই যেমন তুমি আমার সাথে কয়েকদিন কথা বলে ধরে নিয়েছ আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। ফলে তুমিও আমার প্রেমে পড়লে। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সত্য থিউরি। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি প্রেমে পড়ে।
চুপ করো।

আচ্ছা যাও চুপ করলাম। তুমি বলো।
তোমার জীবনে আমি কি সত্যিই কিছু না?
কোনোদিন কি বলেছিলাম এমন কিছু?

মিমি এবার প্রচণ্ড রেগে একটা চড় বসিয়ে দিলো। আমি এতে রাগ করলাম না। আমি জানি রাগটা করেছে সে নিজের উপর। এতবড় একটা ভুল করেছে, সেই রাগ কমাতে এই কাণ্ডটা।
রাগ কমেছে?
দ্যাখো মিমি, আমি পরিবারের বড় ছেলে। পরিবারের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। বেতন যা পাই তার অর্ধেক বাসায় পাঠাই। বাকিটুকুতে কোনোমতে দিন কাটিয়ে দিতে হয়। নিজের চিকিৎসাটুকুও নিয়মিত করতে পারি না। তোমাকে রাখব কোথায়, খাওয়াব কী? আমার জন্য পালিয়ে আসাটা বোকামি ছাড়া কিছুই না। তুমিও সেই হিসেবে একটা বোকা।
তোমাকে চুপ করতে বলেছি।
আচ্ছা যাও চুপ করলাম।

কাউন্টার খোলার পর দেখলাম রংপুরের কোনো গাড়িতেই সিট নেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শেষ, সব টিকিট অগ্রিম বুকিং হয়ে গেছে। ভালো সমস্যা হলো।
আমি মিরপুর মামার বাসায় গিয়ে উঠব।
মিরপুরে মামার বাসা আছে আগে বলোনি কেন?
মিমিকে নিয়ে ইতিহাস গাড়িতে উঠে বসলাম। মিমি অপলক বাইরে শূন্যে চেয়ে আছে। তার চোখে পানি চলে এসেছে। ঠোঁট কাঁপিয়ে সে আবার কান্না শুরু করল। সে আমার মামার বাসা নিয়ে আগ্রহকে পাত্তা না দিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি নির্বিকারভাবে তার হাত ধরলাম। সে বাঁধা দিলো না। শুধু বাম হাত দিয়ে আমাকে সজোরে একটা চড় দিয়ে চুপ করে কান্না করতে লাগল। তবে সে তার ডান হাতটা ছাড়িয়ে নিলো না।

মিমি একটা খাম পাঠিয়েছে। খামের ভিতর একটা বিয়ের দাওয়াত কার্ড আর দুইটা চকচকে হাজার টাকার নোট। একটা চিঠিও আছে। চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম।

তমিম,
আমি মরে যাবো। সত্যি সত্যি মরে যাবো। তুমি আমাকে বুঝতে পারনি। বুঝতে পারলে সেদিন আমাকে এভাবে পাঠিয়ে দিতে না। আমি মরে গেলে তার জন্য তুমিই দায়ী থাকবে। সেই ব্যবস্থা আমি করে ফেলব দেখো। আব্বা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। ছেলের বর্ণনা দেওয়ার সময় নেই। আব্বা আমার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, বন্ধুদের কাছ

থেকে টাকা নিয়ে তোমাকে পাঠালাম। তুমি প্লিজ চলে এসো। আমাকে নিয়ে যাও। আমি পারছি না। আমি সত্যিই পারছি না।

আমি তোমার কাছে কিছুই চাইব না। সত্যিই কিছু চাইব না। তোমাকে আমায় ভালোবাসতে হবে না। শুধু আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। হাতে সময় নেই। চিঠি পেলেই ফোন দেবে। আমি মরে যাচ্ছি। প্লিজ আমার এই কথাটা শোনো।

মিমি আমাকে ফোন দিতে পারছে না। কারণ আমি তার নাম্বারটি ফোনের কালো তালিকাভুক্ত করেছি। আমি বিয়ের কার্ড খুললাম। বিয়ে ২৩ ডিসেম্বর মানে আগামী পরশু। চিঠিতে দেওয়া একটা নাম্বার। এই নাম্বারে ফোন দিতে হবে। মিমির আমার কাছে শেষ চাওয়া। আমি নাম্বারটায় ফোন দিলাম। নাম্বারটি ওয়েটিংয়ে পাওয়া গেল। দ্বিতীয়বার ফোন দিলাম না।

মিমিকে বলেছিলাম যে নিজের চিকিৎসাটুকু নিয়মিত করতে পারি না। কিন্তু কোন রোগের চিকিৎসা তা মিমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছে। মিমিকে তো বছরতিনেক আগে করা বায়োপসি রিপোর্টটির কথা বলা হয়নি। যাহোক, সুখে থাকো মিমি। সুখে থাক ভালোবাসা।

# গন্তব্য

মোঃ জোবায়দুল ইসলাম
ম্যানেজার, সেল্‌স এন্ড মার্কেটিং
বাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড

১১

মানুষ কি আর হাতি হয় বাহে! হামার মতো মানুষগুলা যদি হাতি হইল হায়, তাইলে হামাক নিয়াও মাতামাতি লেখালেখি হইল হয়। ওমরাতো আর হামার একখান খবর বারে বারে ন্যাকে না। হামারগুলার চেহারা দ্যাইকপার আসি চাইর পাশে হাতি হাতি গল্প শুরু হইছে। সাংবাদিকের আর কাম নাই আজাইলা ফ্যাদলা পাইরব্যার আইসছে।

খবরদার খবরদার আর হামারগুলার ছবি তুইলব্যার নন। হামরা কি সরকারি চিড়িয়াখানার বাঘ ভাল্লুক যে হামাক নিয়া তোমরা ফটো শো শুরু করি দিছেন। এই বন্যাত ভারত থিকি যে হাতি ভাসি আইসছে তার কাছে যাও, তার ছবি তোলো। হামার মতো হাজার হাজার ভাসা মাইনষ্যের ছবি তুলি, আজাইরা ক্যাদলা পারি তোমার কী লাভ? আইজও হামার যা, কাইলও হামার তা। মাঝত থিকি কত নেতা ফ্যাতা আইসে কত বড় বড় বকতিতা দেইল, হামাক নিয়া হেটা কইরবে, হোটা কইরবে। কই? কই? কাইছিলু হইল!

কি এ্যাহনা খাবার, কি এ্যাহনা রিলিফের চাউল মনের দুঃখে কী আর কইম বাহে হাসি বাড়বার নাইগছে– যহন এহনা রিলিফ আইসে তোমার গুলার ছবি তুলতে তুলতে রিলিফ শ্যাষ।

হা হা, সত্যিই হাসছে...

কাইওবা পাইল কাইওবা না পাইল। কত মানুষ- কী কইম বাহে, মোর জীবন থিকি যেইগল্যা চলি গেইছে হামার জীবন থিকি সেইগল্যা চলি গেইছে, সেইগল্যা কোনটে পাইম গো দাদা, কোনটে পাইম। মুহূর্তেই মানুষটি ডুকরে কেঁদে ওঠে। চারপাশে আরো মানুষের কান্নার শব্দ- সবকিছু হারিয়ে সব হারিয়ে জীবনের স্মৃতিচিহ্নগুলো যেন নীরব কান্নায়, আর্তনাদে বুকের চারপাশ ভরে গেছে।

এসেছি এক আশ্রয়কেন্দ্রে। মানুষগুলোর জীবনের সাথে মিশে, চেষ্টা করি তাদের সাথে মিশে যেতে। তাদের জীবনে ভাঙনের যে জ্বালা, হারানোর যে যন্ত্রণা, তা থেকেই তাদের

মুখে চাওয়া না পাওয়ার অনেক হিসেব। যখন তারা কথা বলে সত্যিই মনে হয় এ মানুষগুলো জন্ম থেকেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ছে। তাদের কণ্ঠেই তো সত্য সহজ সরল প্রতিবাদী স্বর ভাসবে।

এলা হামার পানি নিয়া হামরা বাঁচি না এলা ভারতও হামার দিকি পানি ছাড়ি দিছে। কনতো বাহে এ কেমন জ্বালা? যহন হামার পানি নাগে তহন ওমরা আটকেয়া রাহে। নদী শুকায়া যায়, কত খরা, ভুই নিড়ব্যার পাই না, ফসল ফলবার পাই না, পানি দিবার পাই না। কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট বাদে সব উপজেলার সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত। কুড়িগ্রামের উপর দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী প্রবাহিত। যার অনেকগুলিই ভারত থেকে উৎসারিত।

ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, জিঞ্জিরাম, সোনাভরি, সংকেশ, নীলকমল, কালজানি, কীর্তিনাশা, ফুলকুমার বিচিত্র নামের এসব নদ-নদী এ জনপদের যেমন অনেক কিছু গ্রাস করেছে, অন্যদিকে এ অঞ্চল হিমালয় পর্বত ও আসামের গারো পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় এর গুরুত্বও ছিল অপরিসীম।

ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় দেশি-বিদেশি নিষ্ঠুর শাসন শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত, বিপর্যস্ত হয়েছে এ অঞ্চলের মানুষ। তবু তারা থেমে থাকেনি, এগিয়ে গেছে প্রতিনিয়তই লড়াই করে। এক প্রবীন লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছে এগিয়ে যাই, তিনি কিছু বলার অপেক্ষায়, তিনি স্মৃতিচারণ করছেন– এই ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া বাহে ব্রিটিশ আমলে বড় বড় জাহাজ চলাচল করেছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব এ অঞ্চলের মানুষ মানি নেয় নাই। ব্রিটিশ কোম্পানির দালাল দেবী সিংহ ও হরে রাম এ অঞ্চলত দেওয়ান হয়া আইসে, এমার অত্যাচার আর শোষণে দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এ সংগ্রামে হিন্দু, মুসলমান এক হয়া লইড়ছে, মুক্তির জন্য হাতে তুলি নিছে অস্ত্র। কী আর কইরবে– এ অঞ্চলের হাজার হাজার নর-নারী শিশু অনাহারে, অর্ধাহারে মইরছে। জানতে পারি মজনু শাহ, নূর উদ্দিন কারেক জং, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, দয়াশীল, মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ প্রমুখের নেতৃত্বে করেছে জীবনপণ সংগ্রাম। ফকির সন্যাসী বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ নামে এগুলো আখ্যায়িত করা হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে এগুলো ছিল এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জনপদের মানুষের অবদান স্মরণীয়। সেজন্য এ অঞ্চলের মানুষের উপর শুধু স্টিম রোলার চালানো হয়নি, এ জনপদকে অবহেলিত ও পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞ এ প্রবীনের কাছে আরো অনেক কিছুই জানার ছিল, তার মুখের দিকে তাকাতেই একটু অট্ট হেসে বললেন– প্যাটত ক্ষিদা, মনের ক্ষিদা থাইকলে কি আর গল্প আইসে বাহে, কওয়ার মতো হামার অনেক ইতিহাস আছে।

আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। কেউ নীরব– নিস্তব্ধ, কেউ তাকিয়ে আছে দূরের কোনো অচেনা সময়ের দিকে– যেখানে জীবন ছিল, যৌবন ছিল, প্রেম ছিল, ঘর-সংসার

ছিল, কারো ঘর বাঁধার স্বপ্ন ছিল। কেউ কিছু কিছু বলতে চায়, কারো কারো বলার ভাষা নীরব নিথর। না বলা ভাষা, অনুচ্চারিত শব্দ নিমজ্জিত হয়ে আছে বহুকাল ধরে। ছোট্ট শিশু তার হাতে জড়িয়ে রেখেছে তার পাঠ্য বইগুলো। জানতে চাই কী তোমার নাম? নাম শুনি জী হইবে বাহে, হামার স্কুল ভাঙ্গি গেইছে, হামরা এলা কেমন করি স্কুল পইড়মো, কই যামো, কই থাইকমো! বিপর্যস্ত শিশুটির হাতে ধরা বই যেন সারা বিশ্বে জানিয়ে দেয় তার প্রিয় বইগুলো হবে তার জীবনের বেড়ে ওঠার গল্প। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এই শিশুটির মতো আরো কত শিশু, কত ছাত্রের বই খাতা, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, ধর্মীয় উপাসনালয়। ভেসে গেছে গৃহপালিত পশু, ঘর, সংসার, সংসারের ভিটেমাটি– কোথাও কোনোকিছুর স্মৃতিচিহ্ন নেই। চারদিকে শুধু পানি আর পানি, সর্বগ্রাসী শব্দ আর ভাঙ্গন।

দূরে তাকিয়ে আছে আমেনা বিবি। এই চোখে কত স্মৃতিচিহ্ন– একলা মনে বিড়বিড় করে বলছে তার একান্ত কথোপকথন তার একান্ত নিজের সাথে। এখানে কারো জীবনের গল্প কারো কাছে বলবার মতো নয়, সবাই সব জীবনের গল্প জানে।

বাপ-দাদার সম্পত্তি ভাঙ্গি গেইছে তাতে দুঃখ নাই। কোনটে মোর বাপ-দাদার কবর, কোনটে মোর মায়ের কবর, কোনটে মোর ভাইয়ের কবর, কোনটে মোর বইনের কবর। মুই এলা কার কাছে যাইম। এই ছোট বুকটাত ক্যান এত বড় জ্বালা, এত বড় বড় কষ্ট, ডুকরে কেঁদে ওঠে। কান্নার রোল আরও দূর থেকে থেকে ভেসে আসছে। এক মায়ের পানিতে ডুবে মরেছে তার কোলের সন্তান। তার নাড়িছেঁড়া বুকের ধনকে কোথায় খুঁজে পাবে, পানিবন্দী মানুষগুলো অনেকেই বিভিন্ন রোগ শোকে জর্জরিত তাদের কাছের মানুষগুলো কে কী করবে, কোনো এক চাপা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিবারের অসুস্থ মানুষটি মরে গেছে। কান্না ভুলে কোথায় নিয়ে যাবে, কোথায় দাফন হবে? কত পরিবার অজানা গন্তব্যে ছুটে চলছে, কোথায় যাবে? জীবনে কত বৈচিত্রের কষ্ট, চারদিকে থৈ থৈ পানির মহাসমারোহ তবুও খাবার পানির কষ্ট, মানুষগুলো বড্ড ক্লান্ত, তাদের তেষ্টা মিটাতে হবে- তেষ্টা। কোথায় এ পানির উৎস! ঋণের টাকায় কেনা রেজিয়া বিবির বকনা বাছুরটি মরে বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। রেজিয়া বিবির মতো আরো কত রেজিয়া এখানে ঋণের বোঝার কষ্ট! তার সামনে দণ্ডায়মান ভদ্র মানুষটাকে রেজিয়া বিবি বোঝাতে চেষ্টা করে– তোমরা কি মানুষ নন বাহে! হামরা তো না মরিয়াও মরি গেছি, এই মরার প্যাটত ভাত নাই- তোমরা আইসছেন কিস্তি বুলি।

এই প্রতিকূল পরিবেশে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে কিছু প্যান্ট সার্ট পরা কর্মী। ঘোরাঘুরি করছে কাউকে খুঁজে ফিরছে এমন– গ্রামীণ ব্যাংক, আরডিআরএস, ব্র্যাক, আশা ও বিভিন্ন এনজিওর কর্মী। তাদের একজনের প্রত্যুত্তর, "দরকার হলে তারা খিচুড়ি খেয়ে বাঁধের রাস্তায় রাত কাটিয়ে হলেও কিস্তি নিবেন, মরলেও মাফ নাই।"

এ কেমন নির্মম সত্য! সত্যিই রেজিয়া বিবি ছুটছে, কোনো সুদখোর মহাজনের খোঁজে যেখানে এক সুদখোর দাঁড়িয়ে আছে, তার সুদ মেটাতে আরেক সুদখোরের কাছে।

স্মরণীয় বাসন্তির জাল পরা ছবি,
কাঁটাতারে ঝুলন্ত ফেলানীর রক্তাক্ত লাশ–
সারা বিশ্ব দেখেছে, সারা বিশ্ব জানে কিন্তু কেন?

কী অভিশাপ, কী পাপ এই মানুষগুলোর?
ভাবতে লজ্জা লাগে। এই অঞ্চলের মানুষকে এদেশেরই মানুষগুলো মঙ্গা কবলিত, মঙ্গা বলে, মফিজ বলে। কথিত আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলিত মানুষগুলো যখন কাজ খুঁজে পায় না, তখন তারা ছুটে চলে কাজের সন্ধানে। অসহায় এ মানুষগুলো কারো কাছে হাত পাতবার পাত্র নয়। কাঁধে কোদাল, হাতে কাঁচি, কাজের সরঞ্জাম নিয়ে ছুটে চলে। তাদের কাছে যাবার পর্যাপ্ত তাড়া নেই কিন্তু যেতে হবে দূরে। যে ক'টাকা যোগাড় করেছে, ধার নিয়েছে তা দিয়েই যেতে হবে। চলমান সব মানুষগুলো যখন যানবাহনের ভিতরে বসার আসন নিয়ে বসে যায়, তখন এ অসহায় মানুষগুলোর সাথে বাসের কন্ডাক্টরের সমঝোতা হয় তাদের ভাড়ার পরিমান নিয়ে। তারপর ঝুঁকি নিয়ে বাসের ছাদে উঠে চড়ে। কোনো একসময় এ মানুষদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মফিজ। সবাই বাসের ছাদে উঠছে, মফিজকেও উঠতে হবে। সঙ্গে তাদের কেউ একজন ডাকে– এই মফিজ, এই মফিজ উঠে আয়, তাড়াতাড়ি ওঠ। উপস্থিত যাত্রীর মধ্যে কেউ, কে বা কারা শুনে– তাচ্ছিল্যতায় এ নামটি ছড়িয়ে পড়ে।

এরা সহজ সরল মাটির মানুষ। তারা কর্মঠ, ত্যাগী, তবু কারো কাছে মাথা নোয়াবার নয়। ভিক্ষা নয়। কেউ একজনকে বলতে শুনি– কাইও কবার পাবার নয়, হামার দ্যাশের মানুষ সবাই জানে কুড়িগ্রাম উত্তরাঞ্চলের মানুষ ভিক্ষা করে না– কাজ করি খায়।

বন্যার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত। সাংবাদিকরা সংবাদ প্রচার করছে। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তায় এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছেন। আমরা আজ ডিজিটাল দেশের স্বপ্ন দেখি কিন্তু কীভাবে? আমরা ক'জন এ নিয়ে কথা বলছিলাম। কুড়িগ্রামের দারিদ্রের হার ৬৩%। এখন জেলার অধীনে ভারতীয় ১২টি ছিটমহল যুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল ছিটমহল দাসিয়ারছড়া এখন কুড়িগ্রামের অংশ। শিক্ষার হার ৫৮%। যুগ যুগ ধরে শোষণ বঞ্চনায় অবহেলিত এ জনপদকে এক রকম পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। দেশের এ বৃহৎ পঙ্গুত্বের বোঝা বহন করে কীভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ, নিজেদের মধ্যম আয়ের দেশ বলতে পারি।

আপনারাই বলেন– পাগলে কি না বলে। আমরা কেউ নিজেদের যুক্তি তর্কে জড়াতে চাই না। দেশের সরকার এগিয়ে আসুক কিংবা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শিল্পভিত্তিক যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন চিলমারী বন্দরের পুণঃনির্মাণ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন বিবিধ বিষয়ে। এরকম অনেক ভাবনা কে বা করবে কার জন্য!

বনভাসী মানুষগুলোর কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চায় কেউ, আবার অযাচিত প্রশ্নও করে বসেন তারা। উপস্থিত একজনের কাছে এক সংবাদকর্মী জানতে চাচ্ছে, আপনারা এত সহজ সরল মানুষ আপনাদেরকে মফিজ বলা হয় কেন? গর্জে ওঠে ব্যক্তি– মফিজ কি তোমার -- ---? যামরা কয়, তামরাই মফিজ। কোনো বিবেকবান মানুষ এই কথা কবার পাবার নয়। হামরা মফিজ হইলে এই দ্যাশের সরকার মফিজ, এই দ্যাশের সারা মানুষই মফিজ। হামরা কি গঙ্গাত ভাসি আসছি? হামাক ছাড়ি কি এই বাংলাদেশ।

সংবাদকর্মী বুঝতে পেরেছে এ মফিজ তো সেই মফিজ নয়। সে ব্যাগ গুছিয়ে ছুটে চলে, তার অনেক কাজ। বন্যার পানি বেড়ে চলছে, ভেসে আসা হাতিটির প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। বন্যার পানি এখন কমতে শুরু করেছে। মানুষগুলোর চোখ উচ্ছল প্রাণবন্ত। তারা আবার নিজেদের গড়তে শুরু করবে। তারা নামছে, এগিয়ে আসছে।

মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে সংগ্রামী এ জনপদের অনেক স্মরণীয় ইতিহাস জানতে পারি। হারুনুর রশীদ লাল তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উলিপুরের হৃষিকেশ মজুমদার সর্বপ্রথম ভারতের ত্রি-বর্ণ পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নাজির হোসেন ও যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কুড়িগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে নারীরা এগিয়ে আসে।

৭১ এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর ৮ মার্চ বেতারে প্রচারের পর ৯ মার্চ থেকে কুড়িগ্রামের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৭ মার্চ কুড়িগ্রাম চিলড্রেন পার্কে প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়। ১৮ মার্চ তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ে উড্ডীয়মান পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে তুমুল যুদ্ধ এ জনপদের ৬ ও ১১নং সেক্টরের বিভিন্ন অংশে হয়েছে। রণাঙ্গনের কিশোরী তারামন তাদেরই একজন।

হামার আছে বেগম রোকেয়া, আছে আব্বাস উদ্দীন, কাছিমুদ্দিন, আছে সব্যসাচী সৈয়দ শামছুল হক, আছে আরো অনেক অনেক। আছে হামার নেতা নুরলদীন। আবার নুরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় দিবে ডাক– জাগো বাহে, কোনঠে সবাই।

বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। রোগ শোক জীর্ণতা ভুলে মানুষগুলো আবার জাগবার

নেশায় ছোটাছুটি করছে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই মানুষগুলোর মাঝে অনেকেই আছে যারা রণাঙ্গনের তারামনকে চেনে না, নুরলদীনকে চেনে না আর এরা জানবেই বা কী করে এরা জীবনযুদ্ধে সব সময়ই মুক্তিসংগ্রামী একেকজন তারামন, একেকজন নুরলদীন।

হাতিটা বোলে মরি গেইছে
এই অবলা হাতিটা মরি গেইল
এত বড় হাতিটা মরি গেইছে।

বাতাসের কানে ভেসে আসছে– বঙ্গ বাহাদুর, যে বন্যার সময় পানিতে ভারতের আসাম থেকে ভেসে এসেছিল– বন্যায় কবলিত এ দেশের মানুষের জীবন বৈচিত্র্য দেখতে; প্রকৃতি তাকে নিয়ে এসেছে, সে মরে গেছে; তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। বাতাসে বাতাসে বুকের নির্দিষ্ট এক কোণে তাকে হারানোর চিন চিন অচেনা এক ব্যথা, কোনো এক শব্দ বানভাসী মানুষের সাথে যোগ হয়েছে। সে যেন তাদেরই মতো, তাদেরই এক নির্মম হত্যার এক সচিত্র রূপ।

# অতঃপর

আতিকুল ইসলাম অপু
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআর-ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
বাবিলন গ্রুপ

১১

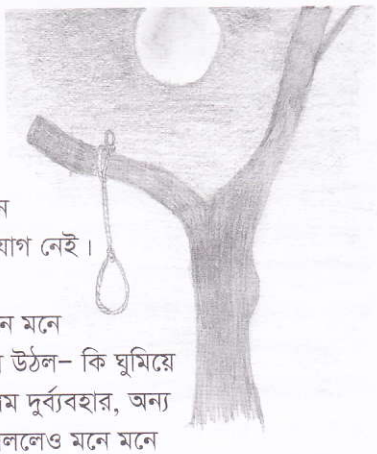

তর তর করে চুল কেটে চলছে নাপিত। আরে ভায়া একটু ধীরে, ভালো করে কাটো! খেকিয়ে উঠল লোকটি। এই গ্রামে ঐ একটিই নাপিতখানা। চাউস বটগাছের তলে একখানা লাল ইটের পিঁড়ি, মাথার উপরে বট গাছের প্রকাণ্ড ডালপালা, শিকড় যেন দড়ি বেয়ে নিচে নেমে পড়েছে। চোখের সামনে একখানা পুরাণা আয়না, মুখের আকার বুঝারও সুযোগ নেই।

আজ হয়তো জীবনের শেষ চুল বিসর্জনের দিন, মনে মনে ভাবছে আর বিড় বিড় করছে। নাপিত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল– কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, ওঠো তোমার চুল কাটা শেষ। কী চরম দুর্ব্যবহার, অন্য নাপিত থাকলে তোমার কাছে আসে কে, মুখে না বললেও মনে মনে সেরকম তীব্র নিন্দা করল। কিছু মানুষ থাকে আজব প্রকৃতির, নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য প্রজন্মের জন্ম দেয় না। নাপিতটাও তার ব্যতিক্রম না।

বিশাল ধানের ক্ষেত, আইলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে সে, ধানের শীষে ফড়িংগুলো খেলছে, স্বাধীন। মনে হচ্ছে কেউ যেন ফড়িংগুলোকে নৃত্যের ইঙ্গিত করেছে, আচমকা মৃদু বাতাস ধানের শীষে দোলা দিয়ে যাচ্ছে, একটা ধানের শীষ আর একটা শীষের গায়ে প্রণয়ের আবেগ লাগিয়ে দিচ্ছে। ধানক্ষেত পার হতেই জঙ্গল আর কিছু দূরে তার বাড়ি। আজ রাতে জঙ্গলে আসতে হবে, এই ভেবে সে জঙ্গলে ঢুকে ভালোভাবে পুরণো শিমুল গাছটি পরখ করে নেয়। যে মানুষটা আজ রাতে আত্মহত্যা করবে, তার নাম পরাণ। তার পিঠাপিঠি তিনটি কন্যা সন্তান আছে। স্ত্রী অন্তসত্ত্বা, এবারও মেয়ে হবার সম্ভাবনা, গায়ের অভিজ্ঞ দাইয়েরা অভিমত দিয়েছেন। তবুও আজ রাতে তার শিমুল গাছের তলে ঝুলে পড়বার কথা।

এবার পদ্মায় প্রচুর ইলিশ ধরা পড়েছে, ইলিশের দামও তুলনামূলক কম, আজ রাতে ইলিশের ঝোল তাও আবার সরষে ইলিশ, মরবার সময় কার্পণ্য করতে নাই, আজই তো শেষ। বড় মেয়েটা আঠার পেরিয়েছে। পড়াশুনার খরচের অভাবে স্কুল ছেড়েছে বছর তিনেক আগে, পাশের বাড়ির কোতয়াল নরেন্দ্র নাথ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলছে। বলবেই না কেন, খেয়ে না খেয়ে মেয়েটা গায়ে গতরে লম্বা টনটনা হয়েছে। মরবার সময় এতসব চিন্তা করতে নাই, নিজের অজান্তেই বলে উঠল পরাণ। দিনকুড়ি হলো পাটের দড়ি কিনে রেখেছে পরাণ, এই দড়িতেই সে ফাঁস দিবে। প্রায় পনের হাত লম্বা, ফাঁস দিতে

পনের হাতও লাগে না। তবুও সে কিনেছে। দড়ি কিনে বাসায় আসার পর স্ত্রী প্যাচাল শুরু করল, সব গরু-ছাগলের তো দড়ি আছেই, নতুন করে কেনার কী দরকার ছিল। এভাবে অপচয় করলে সংসার চলবে? পরাণ এক দৃষ্টিতে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, এটাকে সম্ভবত আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা বলে। বাইশ বছর দুজনার সংসার, এক বিছানায় ঘুমায়। পাশাপাশি বালিশে শুয়ে থাকে, কিন্তু পাশাপাশি থাকা মানুষটার ভিতরে কী চলছে স্ত্রী জানে না। পরাণ অবাক হয়, এত দিনেও আমাকে বুঝতে পারেনি, কী অদ্ভুত এই পৃথিবী!

পূর্ণিমার রাত! জ্বলজ্বলে চাঁদ, যেন খড়ের চালা ছেদ করে ঘরে ঢুকে পড়ছে। আকাশের সাদা সাদা মেঘগুলো খুব ছোটাছুটি করছে, চাঁদের দুপাশে অসংখ্য তারা। হাজার, লক্ষ, কোটি জ্বলছে আর নিভছে। হঠাৎ পাশ থেকে বারান্দায় হেঁটে বেড়ানো মেয়েটা বলে বসল– বাবা, ঐ ছোট ছোট তারাগুলো কী, ঐখানে কি মানুষ থাকে? প্রত্যুত্তরে বাবা বলল– হ্যা রে মা, এগুলো স্বর্গ, 'মানুষ মরে গেলে ওখানে চলে যায়।' তাহলে আমরা মরলেও কি ওখানে চলে যাবো? কী মজা আমরা স্বর্গে যাবো। মৃত্যু কী তা বোঝার এখানো বয়স হয় নাই মেয়েটার। ছোট মেয়েটা অনেক আগে থেকেই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, কোনোরকম আঞ্চলিকতার রেশ নেই, ওর মা শিখিয়েছে, ওর মায়ের খুব শখ ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তার বানাবে।

ঘরের কোণে কুপি জ্বলছে, তেল ফুরিয়ে যাবার মতো অবস্থা। ঘরে কেরোসিনও নাই। তাই তড়িঘড়ি করে পাটের দড়িটির এবড়ো থেবড়ো অংশগুলো আগুনে সেঁকে নিচ্ছে। এবড়ো থেবড়োর চেয়ে মসৃণ কড়কড়া দড়িতে মৃত্যু তাড়াতাড়ি হয়। পরাণ মনে মনে একটু অন্যরকম তৃপ্তি পাচ্ছিল এই ভেবে যে সে নাইলনের দড়ি না কিনে, পাটের দড়ি কিনেছে। নাইলনের দড়িতে মৃত্যু হয়তোবা হবে, কিন্তু গলা ছিলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষ কী বিচিত্র রকম অদ্ভুত প্রাণী, ওরা মরতে রাজি কিন্তু কষ্ট পেতে রাজি না।

পাটের দঁড়ি যখন আগুনে সেঁক দেয়া হচ্ছে, তখন বড় মেয়েটা এসে বাবার পাশে বসল, হাসতে হাসতে মেয়েটা বলল, একখান কথা কই বাবা– কামলা খাইবে ডাইল, তার আবার তেলানি কী। কামলা মজুরদের ছোট করা বড় ধরনের বাজে ব্যাপার। বাবা বুঝেও বলল বুঝিনি, বুঝিয়ে বল। এবার মেয়েটা হাসি থামাতে পারল না, হাসতে হাসতে বলল– গরুর গলায় দড়ি দিবা সে দড়ি আবার সেঁকি নিতে হয়!

রাত দুইটা, সবাই ঘুমাচ্ছে। পরাণের চোখে ঘুম নাই। সে উঠে পড়ে দড়িটা নেয়। লুঙ্গির কোছায় পেঁচিয়ে নেয়, কেউ যেন বুঝতে না পারে। নতুন লুঙ্গিটা পাল্টিয়ে পুরণো লুঙ্গিটা পরে, নতুন লুঙ্গিটা তার স্ত্রীর দেয়া, তাছাড়া চিতায় মানুষ পোড়ানোর সময় তার গায়ের সমস্ত কাপড়ও পোড়ানো হয়। মারা যাবার পর তার স্ত্রী না হয় লুঙ্গিটা দেখে সময় পার করবে। তার স্ত্রী বিকালবেলায় স্বামীর কাপড়গুলি ভাঁজ করে গোছায়, গন্ধ শুকে! পরাণ

প্রায়শই চুপি চুপি লক্ষ্য করে বিষয়গুলি।

বের হওয়ার সময় স্ত্রীর মুখটা ভালোভাবে দেখে নেয় পরাণ। ফরসা মুখটায় গোলাপী ঠোঁটের নিচে ছোট্ট একটা তিল আছে। এই তিলটা পরাণের ভালো লাগে। আরও ভালো লাগে যখন সে তার ঠেস দাঁতটা বের করে মুক্ত ছড়ার মতো হাসে। কতদিন হয়ে গেছে। সেই হাসি দেখে না পরাণ। শেষবারের মতো একটু আদর দিতে গিয়ে আটকে যায় সে। তার স্ত্রীর ঘুম খুব পাতলা। যদি সে জেগে ওঠে?

ঘর ছাড়ে সে। কিছু কিছু কথা থেকে যায়। লেখাপড়া জানে না সে, জানলে চিঠি লিখে দিতে পারতো। অন্ততপক্ষে মরার আগে মনের হাহাকারগুলি লিখে যাবার জন্য হলেও পড়াশুনা করা দরকার। পাশের ঘরটাতে ঢোকে পরাণ। এই ঘরে তার মেয়েরা থাকে। একটা বিছানায় ওরা তিনজন ঘুমায়। মরার আগে শেষবারের জন্য মেয়েগুলোকে দেখা দরকার। বড় মেয়েটা মায়ের মতোই হয়েছে, তার গালেও তিল। মৃত্যুর আগে এত মায়া করতে নাই। হুট করেই বাড়ির বাইরে চলে আসে পরাণ। দড়ির টানের চেয়ে সংসারের টান বেশি হতে পারে না।

শিমুল গাছের পূর্বদিকের ডালটা বেশ শক্ত। এটাতেই ঝুলে পড়ার পরিকল্পনা তার। চাঁদনি রাত। বড় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে অথচ পৃথিবীর কেউ জানেই না। অবাক হয় পরাণ। অন্তত এই শোকে চাঁদটার ডুবে যাওয়া উচিত। মেঘের আড়ালে অথবা অন্য কোথাও লুকিয়ে পড়ে ভদ্রতা দেখাতে পারতো।

দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই ঘরটায় আমার স্ত্রী, আমার কন্যা সন্তানেরা ঘুমাচ্ছে। রাতে বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত পিচ্চি মেয়েটা ঘুমায় না, বাসায় আসা মাত্রই বলে– বাবা, বিস্কুট কই? আমি না থাকলে পিচ্চিটা ঘুমাবে তো, নাকি সারারাত ট্যা ট্যা করবে। তার মা তখন কী করবে? মরার সময় এতসব চিন্তা করতে নেই, সজাগ হয় পরাণ।

শিমুল গাছটা নিষ্ঠুর, ডাল পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ডালের উপরে দড়িটা বেঁধে ফেলে শেষবারের মতো খানিকটা নিচে বসে পড়ে পরাণ। হঠাৎ মাথাটা ঘুরছে, কাজ করছে না কোনোভাবেই। বড় মেয়েটার বিয়ে দেবে কে? এতগুলো পণের টাকা লাগে হিন্দুর বিয়েতে? এত টাকা কোথায় পাবে তার স্ত্রী। খেয়ে পরে চলার মতো তার সংসার না। এতসব চিন্তা ভাবনার মাঝে বারবার তার ছোট মেয়েটার কথাগুলো কানে বাজছে– কী মজা আমরা স্বর্গে যাবো, কী মজা আমরা স্বর্গে যাবো! এ জগতে বাবা হওয়াটা বড় দায়।

# আপনার দিনটি শুভ হোক...

আরিফ হোসেন
সিনিয়র অফিসার, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট
ব্যাবিলন গ্রুপ

১১

এক নির্জন বিকেল। একটু পরেই সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়বে। সূর্যের উত্তাপের প্রখরতা তাই কমে এসেছে। পুকুরপাড়ের কদম ফুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আকাশ তার বন্ধু সোহেলের সাথে মোবাইলে কথা বলছিল। দখিনা বাতাস মনটাকে কেমন যেন উতলা আর শরীরটাকে এক নির্মল প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছিল। বাতাসে ছোট ছোট ঢেউগুলো পুকুরের জলে এক চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করছে যেন। একপাশে ফুটে থাকা লাল শাপলা পুকুরটাকে দিয়েছে আলাদা এক সৌন্দর্য। এমন শান্ত, সুন্দর ও নির্জন পরিবেশে হঠাৎ মুরগির বাচ্চার চিৎকার শুনতে পেল আকাশ।

পাশে তাকাতেই দেখতে পেল– একটা বিড়াল মুরগির বাচ্চা মুখে দৌড়ে পালাচ্ছে। বাচ্চাটার করুণ আর্তচিৎকার বাঁচার প্রবল আকুতি জানাচ্ছে। রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি ইটের টুকরো তুলে নিয়ে আকাশ সজোরে নিক্ষেপ করে বিড়ালটিকে লক্ষ্য করে। ইটের টুকরোটি আঘাত করলেও বিড়ালটি কামড়ে ধরে থাকা মুরগির বাচ্চাটিকে ছাড়ল না এবং মুহূর্তেই চলে গেল পুকুরের একপাশে ঘন জঙ্গলের আড়ালে, আকাশের দৃষ্টিসীমানা ও ধরা-ছোঁয়ার একদম বাইরে। তখনো মুরগির বাচ্চাটির আর্তনাদ শোনা গেলেও দেখা যাচ্ছিল না। এক সময় আর কোনো শব্দ শুনতে পেল না আকাশ। পুণরায় চারপাশটা অদ্ভুত নির্জনতায় ডুবে গেছে যেন। হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটি কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। হয়তো ছোট্ট সুন্দর বাচ্চাটি এতক্ষণে বিড়ালটির আহারে পরিণত হয়েছে। নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হচ্ছিল ছোট্ট সুন্দর প্রাণীটিকে বাঁচাতে না পারার জন্য। যেন অবুঝ শিশুর মতো বুক আকড়ে ধরে আছে অজানা কষ্টেরা। সীমাহীন যন্ত্রণাকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টায় আকাশ উপরের দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল– ছোট্ট একটি মুরগির বাচ্চা দৌড়ে বেড়াচ্ছে পুরো আকাশ জুড়ে। নেই ভয়ার্ত কোনো আর্তচিৎকার, যেন খুশিতে পুরো আকাশটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। বুকে জমে থাকা কষ্টটা সামান্য কম অনুভব হচ্ছে এই মুহূর্তে। বন্ধু সোহেলের ডাকে পাশে ফিরে তাকাল সে। আকাশের ছলছল চোখের করুণ চাহনিতে তার ভীষণ মন খারাপের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট।

সোহেল জিজ্ঞেস করল– কী ব্যাপার, কী হয়েছে তোর? মন খারাপ কেন? না তেমন কিছু না, উত্তর দেয় আকাশ। সোহেল কথা না বাড়িয়ে বলল– ঠিক আছে, চল তোকে আজ কালোজিরা রং চা খাওয়াব। চলে যাওয়ার মুহূর্তে পিছনে ফিরে তাকাল আকাশ, সেই পুকুরপাড়ের ঘন জঙ্গলের দিকে। কিছুক্ষণ পূর্বেই যেখানে হারিয়ে গিয়েছে একটি ছোট্ট জীবনের সমস্ত কোলাহল।

শুক্রবার বলেই ভোরে ঘুম থেকে ওঠার কোনো তাড়া নেই আকাশের। কিন্তু প্রতি শুক্রবারের মতো আজও খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল তার। চোখদুটো এখনো বন্ধ কিন্তু সমস্ত চেতনা অদ্ভুতভাবে জাগ্রত। জোর করেও আর ঘুমানো যাচ্ছে না। অন্যদিন হলে বিপরীত হতো, জোর করেও ঘুম থেকে ওঠা যেত না। আজ তার ব্যতিক্রম। বিছানায় উঠে বসে আকাশ। বারান্দার দরজাটা খোলা দেখতে পেল সে। বিছানা থেকে নেমে সেদিকেই এগিয়ে গেল সে। বর্ষা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। শ্রাবণের আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। ভোরের এই মুহূর্তটাকে তাই সন্ধ্যার মতো মনে হচ্ছে। বারান্দার সামনে একটি ছোট্ট পুকুর। পুকুরের ওপারে একটি বড় কবরস্থান, বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা স্পষ্ট দেখা যায়। বর্ষা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে উদাস নয়নে সেই কবরস্থানের দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে। বাইরে এ মুহূর্তে খুব জোরে বাতাস বইছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। বর্ষার সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে পলকহীন তাকিয়েই আছে। বাইরে এ মুহূর্তে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

কখন ঘুম থেকে উঠলে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন? দেখছ না বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে যাবে, ভিতরে চলো বর্ষা।
বর্ষা কোনো উত্তর দেয় না।

আকাশ লক্ষ্য করল, বর্ষার চেহারায়ও কালো মেঘের ছায়া সুস্পষ্ট। যেকোনো সময়ে যা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে দুচোখ বেয়ে। সুন্দর মেয়েদের মন খারাপ থাকলে বা তারা অন্যমনস্কা হলে তা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সহজেই বুঝা যায়।

বর্ষা, তোমাকে তো বলেছিলাম– এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমার মা খুব ভালো মানুষ ছিলেন, তিনি যেখানেই থাকুন নিশ্চয়ই ভালো আছেন। তাঁর জন্য দোয়া করো। এখন তার এটাই প্রয়োজন। ভিতরে চলো। এবার বর্ষা ঠিকই কান্না শুরু করে দিলো। এই মুহূর্তে ভিতরে বাহিরে সর্বত্র কান্না। বাইরে বিশাল আকাশ পৃথিবীর বুকে বারি বর্ষণ করছে আর ভেতরে বর্ষার দুচোখ বেয়ে বয়ে চলছে লোনাজলের ধারা। নিঃশব্দ কান্না। আজ সকালটা তবে কান্না দিয়েই শুরু হলো। একটি ছোট প্রাণীর জন্য গতকালের বিকেলটাও ছিল কান্নাজড়িত। হঠাৎ আকাশের মনে পড়ে, বর্ষার মায়ের আজ পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। ঠিক এমন একটি দিনেই তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে।

বর্ষার মা রোড এক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার কারণে এমন অকালপ্রয়াণ কারো কাম্য নয়। সেদিন আকাশ আপ্রাণ চেষ্টা করেও বর্ষার মাকে বাঁচাতে পারেনি। তাই দুঃখটা বর্ষার চেয়ে আকাশেরও কম নয়। আকাশ মনে মনে ভাবে– যদি আমরা একটু সাবধান হই তবে এ জাতীয় দুর্ঘটনা থেকে খুব সহজেই নিরাপদ থাকতে পারি। গাড়ির চালকগণ যদি কোনো নষ্ট গাড়ি রাস্তায় না নামান, যদি তারা দায়িত্ব নিয়ে ও ট্রাফিক নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলে গাড়ি চালান, যদি পথচারীগণ রাস্তা দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করেন, তবে অকালে ঝরে পড়বে না কারো প্রাণ। আমাদের মনে রাখতে হবে– সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি, একটি দুর্ঘটনা সারাজীবনের কান্না। জানালা দিয়ে আসা বৃষ্টির ঝাপটায় আকাশ কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। বর্ষাকে নিয়ে রুমের ভিতরে যায়।

রুমে ঢুকতেই আকাশের মোবাইলের এসএমএস রিংটোন বেজে ওঠে। মোবাইল হাতে নিয়ে সে দেখতে পেল– ইনবক্সে একটি মেসেজ এসেছে কিন্তু মেসেজটি না দেখেই মোবাইল ফোনটি রেখে দিলো আকাশ।
কার মেসেজ ছিল, ফোনটি রেখে দিলে কেন? বর্ষা জিজ্ঞেস করল।
নাম্বারটি অচেনা, তাই রেখে দিলাম। তাছাড়া পড়ে ফেললেই তো সব ম্যাজিক শেষ, না পড়া পর্যন্ত একটা কৌতূহল থেকেই যাবে। পরে পড়া যাবে। যদি জরুরি কোনো মেসেজ হয়?
এই মুহূর্তে তার চেয়েও বেশি জরুরি হলো তোমার মায়ের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা ও তাঁর জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট দোয়া করা।

প্রতি হলিডের মতো শেষ বিকেলে বারান্দায় বসেছিল আকাশ। ধোঁয়া ওঠা গরম কালোজিরা রং চা। বন্ধু সোহেলের নতুন আইডিয়া কালোজিরা রং চা। স্বাদটা মন্দ না, সর্বরোগের মহৌষধ এই কালোজিরা। পবিত্র কুরআনেও কালোজিরা ও মধুর গুণাগুন সম্পর্কে উল্লেখ আছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আকাশ লক্ষ্য করে আজ কবরস্থানে প্রচুর মানুষের আনাগোনা, অনেকেই এসেছেন তাদের প্রিয়জনের কবর জিয়ারত করতে। কবরস্থানটা দেখলেই মৃত্যুর কথা বারবার স্মরণ হয়। মনটা তখন কেমন যেন হয়ে যায়। এই সুন্দর পৃথিবীটা কেবলই যে দুদিনের আড্ডাখানা তা মনে পড়ে গভীরভাবে। মৃত্যুকে ভয় পেয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে চায় মানুষ! অথচ মানুষ চেষ্টা করলে পরকালের আযাব থেকে বাঁচতে পারে কিন্তু মৃত্যু থেকে নয়। দুনিয়াটা আসলেই কেবলমাত্র ক'দিনের জন্য কিন্তু পরকাল অনন্ত...

আকাশটা এই মুহূর্তে চমৎকার রূপ ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন সমস্ত আকাশটাকে ক্যানভাস বানিয়ে রংতুলির স্পর্শে এক চমৎকার শিল্পকর্ম এঁকেছেন। একটা ছবি তুলে রাখতে পারলে তা হতো দুর্লভ। কিন্তু আকাশ তো ভালো ছবি তুলতে পারে না। ছবি

তোলাটা একটা শিল্প, সহজ কোনো কাজ নয়। হঠাৎ মনে পড়ল তার– ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের কেউ দৃশ্যটি দেখে থাকলে ক্যামেরাবন্দী করতে ভুল করবেন না। ফটোগ্রাফিটা চমৎকার করেন ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্যগণ।

আকাশ এ কোম্পানিতে আসার পর থেকেই দেখছে– এই কোম্পানি অন্যান্য কোম্পানিগুলো থেকে একটু আলাদা। এখন প্রায় প্রতিটি বড় কোম্পানিই তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারে মোটামুটি সচেতন। ব্যাবিলনও এর বাইরে নয়। তবে ব্যাবিলনে কিছু ব্যতিক্রমী বিষয় রয়েছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়, চমৎকার ও অভিনব। ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাব, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ব্যাবিলন কথকতা-বার্ষিক ম্যাগাজিন, কর্মীদের জন্মদিন উদযাপন করা। এর মধ্যে কর্মীদের জন্মদিন উদযাপন বিষয়টি নতুন। প্রতিদিন যেসব কর্মীদের জন্মদিন থাকে তাদের ডেকে ছোট্ট একটি গিফট বক্স দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়। আকাশের লাইনের দুজন শ্রমিকের সেদিন জন্মদিন পালন করা হয়েছিল। আকাশ দেখেছিল ঐ শ্রমিকদ্বয় কী ভীষণ খুশিই না হয়েছিল সেদিন! তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে এখানে সবচেয়ে যে বিষয়টা বেশি দেখতে পাওয়া যায় তা হলো– কর্মীর প্রতি মালিকের ভালোবাসা, সহমর্মিতা, উদারতা এবং কর্মীর তার মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজ কাজের প্রতি একাগ্রতা। এখানে সবাই একটি পরিবারের মতোই। যার ফলে কারখানায় বিরাজ করছে চমৎকার কর্মপরিবেশ, উৎপাদনও হচ্ছে গতিশীল এবং লাভবান হচ্ছেন মালিক-শ্রমিক উভয়েই।

এইতো কিছুদিন আগেই একজন মালিক তার মেয়ের বিয়েতে কোম্পানির সকল শ্রমিক/কর্মচারীর জন্য দুপুরে উন্নতমানের সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেছেন। পিএ মাইকে টানা তিনদিন বিয়ের গান বেজেছে। মালিকের মেয়ে কর্মীদের মাঝে নিজ হাতে চকলেট বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। এভাবে ব্যাবিলনে মালিক-কর্মীর মাঝে সব সময় অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। এ কোম্পানিতে চাকুরি করতে পেরে আকাশ তাই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে।

প্রকৃতির এই চমৎকার রূপে মুগ্ধ আকাশের টেবিলে রাখা মোবাইলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সকালের সেই এসএমএসটার কথা মনে পড়ে গেল। মোবাইলটা হাতে তুলে নিলো আকাশ। এসএমএসটা দেখা দরকার। মোবাইল হাতে নিতেই নোকিয়ার সেই বিখ্যাত রিংটোন বেজে উঠল। বন্ধু সোহেল ফোন করেছে, তার সাথে কাল গোলাপ গ্রামে যাওয়ার কথা। আগামীকাল তো অফিসও বন্ধ। সোহেল নিশ্চয় বিষয়টি মনে করিয়ে দিতেই ফোন দিয়েছে। আকাশ সোহেলের সাথে মোবাইলে কথা বলছে। বর্ষা এসে আকাশের পাশে বসল।

মোবাইলে কথা শেষে আকাশ বর্ষাকে তার সাথে গোলাপ গ্রামে যেতে বলে।

বর্ষা বলল– মায়ের মাগফিরাত কামনায় আগামীকাল আমি রোজা রাখব ও সারাদিন নফল

ইবাদত বন্দেগি করব। তুমি ও সোহেল ভাই যাও, আমার জন্য দুটো গোলাপ নিয়ে এসো।
শুধু দুটো গোলাপ? যদি চাও তো তোমার জন্য আমি পুরো গোলাপ গ্রামটাই নিয়ে আসতে পারি।
আর কিছু চাওয়ার নেই আমার যদি তুমি সারাজীবন পাশে থাকো, আস্তে উত্তর দেয় বর্ষা।

আকাশ লক্ষ্য করল– বর্ষার হাতে ব্যাবিলন কথকতার দশম সংখ্যা।
খুলে পড়তে শুরু করেছে সে– সোনালী অতীতের সাড়ে ছয়টি মাস।
বর্ষা তুমি আবার এই লেখাটা পড়ছ?
হ্যা পড়ছি, খুব সহজ ভাষায় চমৎকার লিখেছেন তোমার স্যার। যতবার পড়ি ততবারই ভালো লাগে।
তা পড়তে পারো তবে 'বর্ষার আকাশে সাতরঙা মেঘেদের দল' পড়বে না কিন্তু। তোমার চোখের জল আমার ভালো লাগে না। আকাশের দৃষ্টি এখন বর্ষার দিকে, মেয়েটির চোখদুটো অসাধারণ আর মনটা তারচেয়েও ভালো। স্ত্রী হিসেবে বর্ষাকে পাওয়া আকাশের জন্য সৃষ্টিকর্তার সেরা উপহার।

পরদিন সন্ধ্যায় আকাশ বাড়ির বারান্দায় বসে গোলাপ গ্রামের কথা ভাবছিল। ঢাকা জেলায় এমন সুন্দর একটি স্থান থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। মিরপুর দিয়াবাড়ি ঘাট থেকে সাদুল্লাপুর ঘাট, ট্রলারে চল্লিশ মিনিটের ছোট্ট কিন্তু চমৎকার ভ্রমণটাও মনে রাখার মতো। ট্রলারের দুপাশে অথৈ জলরাশি মনে ভিন্নরকম এক আমেজের সৃষ্টি করছিল। মাঝে মাঝে আকাশ হাত দিয়ে জল স্পর্শ করে এক আশ্চর্য সজীবতা অনুভব করছিল। ট্রলারে ভ্রমণ আকাশের এবারই প্রথম। তাই তার ভালো লাগাটাও অনেক বেশি। সব প্রথম অনুভূতিগুলো অন্যরকম হয়। বন্ধু সোহেলের কাছে সে কৃতজ্ঞ। চমৎকার এ জায়গাটির সন্ধান সোহেলই তাকে দিয়েছে। তার জন্যই গোলাপ গ্রামের মতো সুন্দর স্থানটিতে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। আকাশের অনেক ভ্রমণের সঙ্গী স্কুল জীবনের বন্ধু সোহেল।

শহরের নিত্যদিনের কোলাহল ছেড়ে স্বপ্নের গোলাপ গ্রামে (সাদুল্লাপুর) পা রাখতেই একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হলো আকাশের। পুরো গ্রামটাই কেমন যেন কোলাহলহীন, শান্ত ও নির্জন। গোলাপ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই গোলাপ বাগান রয়েছে। এ গ্রামের নাম সাদুল্লাপুর না হয়ে গোলাপ গ্রাম হলেই ভালো হতো। বাণিজ্যিকভাবে এখানে গোলাপ ফুলের চাষ হয়, যা চলে যায় ঢাকাসহ আশেপাশে এমনকি দূরের জেলাগুলোতেও। গোলাপ বাগান দেখতে যে এত ভালো লাগবে, এমন চমৎকার অনুভূতি হবে আকাশের তা ধারণাই ছিল না। একটি গাছে গোলাপ ফুল দেখা আর বাগানে শত শত গোলাপ ফুল দেখা সত্যিই আলাদা ব্যাপার। আকাশ পাতাল রকম পার্থক্য। বাগানে ঢুকলেই বাতাসে দোল খাওয়া গোলাপের মিষ্টি সুবাসে মন-প্রাণ সুবাসিত হয়। স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতায় ভরে ওঠে মন।

মনে মনে যখন এসব ভাবছিল আকাশ তখন বর্ষা অনেকটা নিঃশব্দে এসে হাজির হলো আকাশের সামনে। মেয়েটি সুন্দর করে সেজেছে। আকাশ যেমন পছন্দ করে– হালকা সাজ। চোখে হালকা কাজল, পরনে শাড়ি ও কপালে একটি ছোট্ট টিপ। এমন সাজে বর্ষাকে পরীর মতো লাগে। আকাশ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল বর্ষাকে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় বুঝতে পারল বারান্দায় অনেকক্ষণ বসেছিল সে। চারপাশের ঘন অন্ধকার রাতের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে যেন। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় আকাশ অনুভব করল– রাতের অন্ধকারেরও আলাদা নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে। আর যদি থাকে এমন সুন্দর চাঁদের আলো ও তারার ঝলকানি তবে তো কথাই নেই। আকাশ যখন তার মিতা আকাশের দিকে তাকিয়ে এসব ভাবছে তখন বর্ষার ডাকে তার সম্বিত ফিরে আসে। বর্ষা চার্জ লাইট খুঁজে পাচ্ছে না, ঘরের ভেতর এখনো অন্ধকার। আকাশ তার মোবাইলটা খুঁজতে লাগল। মোবাইলটা হাতে পেতেই তার মনে পড়ল– আরে! মেসেজটা তো পড়াই হলো না! এখন পড়ে ফেলি। ইনবক্সটা খুলে মেসেজটি পড়া শেষ হতেই বিদুৎ চলে এল। যেন মেসেজটি পড়ার জন্যই বিদ্যুৎ চলে যাওয়া আবার ফিরে আসা। মানুষ যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় ভুলে যায় প্রকৃতি তখন কখনো কখনো তা মনে করিয়ে দেয়। আকাশের ঘোর তখনো কাটেনি। তার সমস্ত চেতনা যেন মোবাইলের মেসেজটির দিকে। প্রেরণকারীর নাম্বারটি অচেনা হলেও প্রকৃতি তার নিজ দায়িত্বে মনে করিয়ে দেয়া মেসেজটি দেখে আকাশের মন এখন এক অজানা মুগ্ধতায় নিমগ্ন। সেদিন বিকেলের দুর্ঘটনার জন্য আকাশের ছলছল চোখের করুণ চাহনি, কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে বর্ষার নীরব কান্না এসব কষ্টের মুহূর্তগুলো শেষে এ মেসেজ যেন মন ভালো করার প্রাকৃতিক উপাদান। বিশেষ কোনো বাক্য যে মনটাকে এত ভালো আর মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিতে পারে তা আকাশ এবারই প্রথম বুঝতে পারল। তার মনে হলো– মেসেজটা যেন গোলাপ গ্রামে বাতাসে দোল খাওয়া গোলাপ ফুলের মিষ্টি সুবাস কিংবা সেদিন বিশাল আকাশকে ক্যানভাস বানিয়ে ফুটে ওঠা প্রাকৃতিক সেই শিল্পকর্ম থেকেও বেশি সুন্দর। আসলে সত্য ও শুভ, সে যাই হোক না কেন তা চিরকালই সুন্দর হয়। আকাশের মনে পড়ল– সেদিন তার জন্মদিন ছিল। আকাশ মনের অজান্তেই আবারো ইনবক্সটি খুলে তাকিয়ে রইল– শুভ জন্মদিন, আপনার দিনটি শুভ হোক...।

# মম নিসর্গশোভা

মোঃ গোলাম মাওলা
প্রজেক্ট ম্যানেজার
নিউজেন টেকনোলজি লিমিটেড

ভেবেছ কি কখনো তুমি আমায়?
নীল সাগরের তলা ছুঁয়ে!
কিংবা আকাশের বিশালতায় নিজেকে মিশিয়ে!

আমি ভেবেছি তোমায়-
গ্রীষ্মের গনগনে রৌদ্র-দুপুরে
নিটোল দিঘীর স্নিগ্ধ জলে কেলিরত রাজহংস রূপে।

ভেবেছি তোমায় বর্ষায়-
বৃষ্টির ছন্দে ক্রমাগত নৃত্যরত ময়ুরী রূপে,
কখনো বা কদমের পাপড়ি জুড়ে জমে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা রূপে।

ভেবেছি তোমায় শরতে-
নীলাকাশ জুড়ে স্নিগ্ধ মেঘের আড়ালে সদাহাস্য রবি রূপে,
কখনো বা দিগন্ত ছোঁয়া মাঠে ফুটন্ত কাশফুলের রেণু রূপে।

ভেবেছি তোমায় হেমন্তে-
মেঘমুক্ত আকাশে কোনো এক দুপুরে
টলমলে দিঘীর জলে
উড়ন্ত এক ঝাঁক বকের ছায়া রূপে।

ভেবেছি তোমায় শীতে-
শিশির ভেজা এক সকালে
ঘাসের ডগায় জমে থাকা
একবিন্দু শিশিরে ধারণ করা
প্রকাণ্ড এক ঝলমলে সূর্য রূপে।

ভেবেছি তোমায় বসন্তে-
সদ্য ফোঁটা একটি পাতার কুঁড়িতে
নির্মল সবুজের মাঝে
এক সোনালি আভা রূপে,

কিংবা ঝকঝকে চাঁদনি রাতে
জলে পড়া শিশিরের টুপ টুপ শব্দ রূপে
দিঘীর উপর ঝুঁকে
গাছের পাতা ছুঁয়ে।

# তোমার অপেক্ষায় না ফেরার দেশে

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
ওয়েলফেয়ার অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

সেদিন সন্ধ্যাবেলা খুব গোপনে
সবার অগোচরে তোমার ভালোবাসাকে
তুমি ইচ্ছে করে গলা টিপে
হত্যা করেছ–
যার আর্তনাদ আজো বাতাসের
কানে কানে বাজে।
তোমার বিবেকের আদালতে তুমি দায়ী
তা জানে একমাত্র বিধাতা।

অথচ তুমি বলেছিলে-
আমায় ভালোবাস নাকি পাগলের মতো–
যা নাকি অন্তবিহীন, চিরন্তন।
তুমি আরো বলেছিলে-
চোখের সমুদ্র তলদেশে নাকি আমার বসবাস!
তুমি এও বলেছিলে-
আমি নাকি তোমার একমাত্র প্রেরণার গতিপথ,
তোমার আত্মার দীর্ঘশ্বাস।
আমি বারবার যাবার পথ তোমায় দেখিয়েছি;
তুমি আগলে ধরে বলেছিলে–
আমি নাকি তোমার।

তাহলে আজ এভাবে গলা টিপে হত্যা করলে?
একবারও ভাবলে না কি কষ্ট আমার!
আমি ছিলাম আবদ্ধ,
তবুও শ্রদ্ধা ছিল তোমার ভালোবাসায়।
পবিত্রতায় বেঁধে রাখতে চেয়েছি তোমাকে
আমার মনোগহিনে।
তুমি বুঝলে না, অবাধ্যের মতো
হত্যা করলে আমায়।

আজ আমি মৃত, আমি আর নেই আমাতে;
চলে গেছি অনেক দূরে,
না ফেরার দেশে।
তবে তোমাতে আমার বসবাস থাকবে,
তুমি পাগলের আর্তনাদ করবে এপারে,
আর আমি তোমার অপেক্ষায় রবো
না ফেরার দেশে।

# প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং একজন ওয়েলফেয়ার কর্মী

আয়েশা সিদ্দিকা আরজু
এক্সিকিউটিভ (ওয়েলফেয়ার)
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

১১

একজন সরকারি চাকরিজীবি পিতার সন্তান হিসেবে একান্তই ইচ্ছে ছিল পড়াশুনা শেষ করে সরকারি চাকরি করার। সাধারণ মানুষদের সেবা করা এবং তাদের খুব কাছ থেকে দেখার ইচ্ছেটা তখন থেকেই ভিতরে লালন করতে থাকি। পড়াশুনা করার সময় একদিন বাংলার শিক্ষক জানতে চাইলেন, আরজু, বড় হয়ে কী হতে চাও? সেদিন নিজের অজান্তেই স্যারকে বলি- আমি এমন কিছু করতে চাই যা দিয়ে মানুষের সেবা এবং উপকার করতে পারি। উত্তরে স্যার কেমন যেন বাঁকা হাসি দিলেন, হয়তোবা এই ভেবে যে বর্তমান যুগে নিজে বাঁচলে বাপের নাম, আর আমি চাইছি কাজের মাধ্যমে কাউকে উপকার করতে। তবে সেদিন স্যার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন- দোয়া করি তোর চাওয়া যেন পূর্ণ হয়।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি একজন মাঝবয়সী মহিলা হাতে রং জ্বলে যাওয়া একটি কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে আমাদের বাসার ঠিক কাছাকাছি রাস্তার পাশে বসে আছেন। সাথে ছয়-সাত বছর বয়সী একটি মেয়ে এবং কোলে একটি ছোট্ট বাচ্চা। মনে হয় খুব বিপদে আছেন, কাছে গিয়ে খবর নিতেই তার স্বামী নিরুদ্দেশ হবার কাহিনী শুনালো। পাঁচ-ছয় মাস ধরে কোনো খোঁজ নেই তার। দুটি সন্তান নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন মহিলাটি।

মহিলার কথাগুলো শুনে খুব খারাপ লাগে। কোনো কিছু না ভেবে সাথে করে বাসায় নিয়ে যাই তাকে। বাসায় গিয়ে মাকে সবকিছু খুলে বলি। সব কথা শুনে মাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পাশের বাসার আন্টিও সেখানে বসা ছিলেন। মা বললেন- আমরা আপনাকে বাড়িতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিন্তু আপনি বাড়িতে গিয়ে কী করবেন? মহিলা তখন সবাইকে চমকে দিয়ে মায়ের দুই পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন– আপা দয়া করে আমাকে একটা কাজ দ্যান, এই দুইটা বাচ্চা নিয়ে আমি এখন কোথায় যাবো? বাড়িতে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। কেউ আমার বাচ্চা দুটোর দায়িত্ব নিবে না।

দুপুরে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করলাম। সব কথা শুনে বড় ভাইয়া বলল, রাবেয়া ক্লিনিকে একজন বুয়া নিবে, আপনি যদি ঐ কাজ করতে চান তাহলে আমি বলে দিতে

পারি। তিনি সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলেন। আমাদের বাসা থেকে কিছুটা দূরে একরুমের একটা ঘর ভাড়া করে দেয়া হয় তাকে। মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতনে তিনি চাকরি শুরু করলেন। তিনি অনেক দোয়া করলেন আমার জন্য, আমাদের জন্য। যদিও পরবর্তীতে অনেক বড় একটা সমস্যায় তিনিই ফেলেছেন আমাদের পরিবারকে যার রেশ বয়ে বেড়াতে হয়েছে অনেকদিন, সে কথা নাই বা বলি। কারও কৃতজ্ঞতার হাসি এতটা আনন্দ দেয় তা সেইদিনই বুঝতে পারলাম। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যেভাবেই হোক নিজেকে এমনভাবে তৈরি করব যাতে কারও উপকার করতে পারি এবং কাজের মাধ্যমে মানুষের খুব কাছাকাছি থাকতে পারি।

ইচ্ছেটা যেন সৃষ্টিকর্তার খুব বেশি ভালো লেগেছে, তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই ইচ্ছেটা পূরণ করার মতো একটা চাকরি পেয়ে যাই। চাকরিটা পাওয়ার পর প্রথম প্রথম বুঝতেই পারিনি আমার কাজটা কী? ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাস। দুঃসম্পর্কের এক চাচি জানান তাদের অফিসে ওয়েলফেয়ার অফিসার লাগবে, যদি আগ্রহী থাকি তাহলে আমার একটা বায়োডাটা যেন তাকে দেই। বাসার কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করে চাচির কাছে বায়োডাটা দিয়ে দেই। ওয়েলফেয়ার অফিসার কী, তার কাজটা কী, কিছুই জানি না কিন্তু ওয়েলফেয়ার শব্দটি কেন যেন ভালো লাগে। ভাবলাম শব্দটার মানেতো কল্যাণ, তাহলে হয়তো কল্যাণমূলক কিছু একটা করতে হবে আমাকে। চাচির কাছে জানতে চাইলাম- এটা কি কোনো এনজিও টাইপের কাজ কি না, ফিল্ডে কাজ করতে হয় কি না? চাচি বললেন আসলে ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে আমি নিজেও ভালো জানি না, তবে অফিসিয়াল কাজ, অফিসে অন্য ম্যাডামরা আছেন, তাদেরকে দেখি ফ্লোরে ঘোরাঘুরি করে, কারও কোনো সমস্যা হলে তাদের কাছে জানালে সমাধান দেয়।

চাচির কথা শুনে কিছুটা নিশ্চিত হলাম। কিছুদিন পর ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয় আমাকে। জীবনের প্রথম চাকরির ইন্টারভিউর জন্য যাবো ভাবতেই বুকের ভিতরটা ভয়ঙ্কররকমভাবে কাঁপতে থাকে, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, সারারাত ঘুমাতে পারিনি, যেন সকালই হতে চায় না... ওহ!!! কী যে অসহ্য অস্থিরতা... যারা ইন্টারভিউ দিয়েছেন তারাই বুঝতে পারবেন কী সেই অস্থিরতা। ডিসেম্বরের ছয় তারিখ খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে কোনোরকম একটু নাস্তা খেয়ে নিলাম, মা এবং আব্বাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম (যা বরাবরই করি)।

মা বললেন- কী রে! আজতো কোনো পরীক্ষা নাই সালাম করছিস কেন? তবে আব্বাকে চাকরির বিষয়টি বলেছিলাম, কারণ আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুদের একজন হলেন আব্বা। তাই মায়ের কথা শুনে পাশ থেকে আব্বা মুচকি মুচকি হাসছিলেন। দুই বাপ বেটি মিলে একসাথেই বেরিয়েছিলাম সেদিন। আমার টেনশন আব্বার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না, আমার হাত ধরে বললেন এত টেনশন করার কিছু নাই, সারাক্ষণ হাসি মুখে থাকবি। আমি জানি তুই পারবি ইনশাআল্লাহ। আব্বার কথা শুনে কেঁদেই ফেললাম। আব্বা বললেন একি!

এমনতো না চাকরি পেতেই হবে, না হলে কেউ বকবে, তুমি নিজে থেকে আগ্রহ করেছ আর ইন্টারভিউ দিলে অভিজ্ঞতা হয়।

চাচির সাথে গেটের ভিতরে প্রবেশ করতেই খাকি পোশাক পরা একজন এসে পরিচয় জানতে চাইলেন। আমার হয়ে চাচিই বললেন ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। ভদ্রলোক আর কোনো কথা না বলে একজন মহিলাকে ডেকে বললেন, ওনাকে কমপ্লেক্সে (কমপ্লায়েন্সে) নিয়ে যাও। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় নিয়ে গেলেন তিনি। যতই যাচ্ছি হার্টবিট যেন তেজি ঘোড়ার বেগে দৌড়াচ্ছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। মনে হলো ধুর! থাক ভিক্ষা তোর কুত্তা সামলা, ইন্টারভিউর খেতা পুরি- চলেই যাই। ভাবতে ভাবতেই মহিলা একটা রুমে নিয়ে গেলেন। ওরে মা! গিয়ে দেখি আমি ছাড়াও আরও পাঁচজন একই পোস্টের জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি। বেশ সুদর্শন চেহারার একজন এসে আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন এবং একটা কাগজ হাতে দিয়ে লিখতে বললেন। পরীক্ষার খাতার মতো সেখানে কিছু প্রশ্ন দেয়া ছিল- সেগুলোর উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো বেশ সহজ এবং জানার মধ্যে ছিল তাই তাড়াতাড়ি শেষ করে বসেছিলাম। লক্ষ্য করলাম অন্যরা তখনও লিখেই যাচ্ছে এবং জানতে পারলাম সবারই মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে। অনার্স, মাস্টার্স কমপ্লিট করে এসেছে অনেকেই। নিজের উপর এত রাগ হচ্ছিল.....লজ্জা, ভয় সবকিছু মিলিয়ে আমার যাচ্ছেতাই অবস্থা।

বিষণ্ন মন নিয়ে বাসায় চলে গেলাম। আব্বা বাসায় নেই, বিষয়টা শেয়ার করতে পারছি না। মেজাজটা খারাপ লাগছিল। দুদিন পর ফোন আসলো- বলল হেড অফিসে যেতে হবে, আবার মৌখিক ইন্টারভিউ হবে। ভাবলাম যাবোই না। কিন্তু আব্বা বললেন- অবশ্যই যাবি। আব্বার কথামতো আর নিজের ইচ্ছেটা আসলে কতটা সত্যি তা দেখার জন্য গেলাম। সকাল দশটা থেকে একটানা এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার স্যারের চেম্বারে বসেই আছি। স্যার কয়েকবার আসলেন, বললেন– বায়ার আসছেতো একটু ব্যস্ত, বসেন। শেষটা দেখার অপেক্ষায় বসেই ছিলাম। বিকেল পাঁচটার সময় ম্যানেজার স্যার এবং সহকারী ম্যানেজার স্যার আসলেন, অনেকক্ষণ পালাক্রমে প্রশ্নের বুলেট ছুড়েই যাচ্ছেন আমার দিকে আর আমিও যতটুকু সম্ভব উত্তরের ঢাল দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম। শেষের কথাটি আমি হয়তো জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারব না। মনে হলে আজও আনন্দে মন ভরে যায়। শফিক স্যার বললেন, আমরা একজন সহকারী ওয়েলফেয়ার অফিসার নিবো, আপনিসহ আরও পাঁচজন ইন্টারভিউ দিয়েছেন এবং সবাই গ্রাজুয়েট এবং এক্সপেরিয়েন্সড, কিন্তু আমরা যেমনটি চাচ্ছি আপনার মধ্যে সেরকম কিছুটা পেয়েছি। আপনাকে আমরা এই পোস্টটির জন্য সিলেক্ট করছি। আপনি কবে থেকে জয়েন করতে পারবেন?

আমিতো শেষ.....হাসব, কাঁদব, নাকি নাচতে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। নিজেকে অনেক কষ্টে কন্ট্রোল করে বললাম– আপনারা যেদিন থেকে বলবেন। ফেরদৌস স্যার বললেন- তাহলে কাল থেকে (১০ ডিসেম্বর ২০১০) আসেন। আপনি প্যাসিফিক এর দায়িত্বে থাকবেন। আল মুসলিম গ্রুপের সাথে আমার যাত্রা শুরু হবে আগামীকাল থেকে। সেইদিনই আমার হাতে নিয়োগপত্র দিয়ে দেয়া হলো। অনেক আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম, বাসায় গিয়েই মাকে সবকিছু খুলে বললাম। মা খুব একটা খুশি হলেন না। বললেন– তুই গার্মেন্টে চাকরি করবি, ছি ছি মানুষ কী বলবে! কোনো দরকার নেই ঐ চাকরি করার। কান্নাকাটি শুরু করলেন। আব্বাকে বললেন- আপনি সবকিছু জেনেশুনে মেয়েকে এই কাজের জন্য কীভাবে অনুমতি দিলেন? এই চাকরির কথা শুনে কে বিয়ে করবে এই মেয়েকে?

মায়ের কথা শুনে আব্বাতো হাসতে হাসতে নাই। বললেন- কী যে বলো না তুমি, ও কি মেশিন চালাবে? ও তো অফিসার। মনটাই খারাপ হয়ে গেল, জীবনের প্রথম একটা চাকরি করব, আর মা কি না অসন্তুষ্ট। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আব্বা খুব বুঝালেন মাকে। যাইহোক, অবশেষে মা আমার রাজি হলেন। বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব মাত্র ১০-১৫ মিনিটের হাঁটাপথ। সকাল ৭.৫০ মিনিটে অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার চাকরি জীবন শুরু হলো।

প্যাসিফিক ব্লু জিন্স ওয়্যার লিঃ এ (আল-মুসলিম গ্রুপের শাখা প্রতিষ্ঠানে) আমার চাকরি জীবন শুরু। শুরু হলো নতুন আমাকে চিনে নেয়ার প্রয়াস। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে যাই, বসে থাকি চুপচাপ, ছুটি হলে বাসায় চলে আসি- এইভাবে চলল চার-পাঁচদিন। কী কাজ করব কিছুই বুঝতে পারছি না, আমার কাজ কী সেটাও কেউ বলে দিচ্ছেন না। কয়েকদিন পর সহকারী ম্যানেজার স্যার ডেকে বললেন- আয়েশা, আপনি প্রতিদিন সকালে এসে ২য় তলা মহিলা সিঁড়িতে দাঁড়াবেন, ঠিকমতো লাইনে দাঁড়িয়ে কার্ড পাঞ্চ হচ্ছে কি না সেটা দেখবেন, দিনে দুইবার করে ফ্লোর ভিজিট করবেন, হাউজকিপিং ঠিক আছে কি না, সকল শ্রমিক পিপিই ব্যবহার করছে কি না সবকিছু পর্যবেক্ষণ করবেন, যদি কোনো সমস্যা পান তবে নোট করে রাখবেন এবং তাৎক্ষণিক সমাধান না করতে পারলে আমাকে জানাবেন। স্যারের কথাগুলো শুনছি আর ভাবছি এইগুলো আবার কেমন কাজ।

পরের দিন সকালে নার্গিস আপুর সাথে গেটে দাঁড়ালাম, দেখলাম আপু সবাইকে বলছেন, এই আইডি কার্ড পরো, লাইনে দাঁড়িয়ে কার্ড পাঞ্চ করো ইত্যাদি। সকাল নয়টায় নার্গিস আপুর সাথে ফ্লোর ভিজিট করতে যাই। তিনি শ্রমিকদের টয়লেটে গিয়ে দেখছেন স্যান্ডেল, সাবান, পরিষ্কার কাপড় ইত্যাদি আছে কি না, ফ্লোরে রাখা খাবার পানি থেকে পানি খাওয়া, কাটার, সিজার রশি দিয়ে বেধে কাজ করা, নিডেল গার্ড, সেফটি গ্লাস, আই গার্ড ইত্যাদি যথাস্থানে রেখে কাজ করার ব্যাপারে সচেতন করছেন। আমিও সাথে ঘুরে ঘুরে দেখছি আপু কী করছেন। একসাথে এত মানুষ দেখে আমার খুব নার্ভাস লাগছিল। কেউ কেউ আমার

দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন ভিনগ্রহ থেকে আসা কোনো এলিয়েন দেখছে। লাইনের একমাথায় দাঁড়িয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে আপুকে জিজ্ঞেস করলাম- আপু আমাদের কাজটা কী? আপু তখন খানিক হেসে বললেন- আসলে আমাদের কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরিতো তাই কমপ্লায়েন্স ঠিক আছে কি না তাই দেখছি। বললাম-কমপ্লায়েন্স কী আপু? আপু বললেন- আয়েশা আমি নিজেও খুব ভালো জানি না, তবে যেটুকু জানি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আপুর কাছ থেকে সেইদিন প্রাথমিকভাবে মোটামুটি ধারণা নিয়ে যা জানলাম তার সারমর্ম হলো-

বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ আসে পোশাকশিল্পখাত থেকে। এই শিল্পটিকে সহযোগিতা করছে দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান- ১) বিজিএমইএ ২) বিকেএমইএ। তাদের আওতায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। এইসব পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ বাংলাদেশী হলেও প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে অথবা তৈরি করছে বিদেশিদের পোশাক। যার ফেব্রিক থেকে শুরু করে ডিজাইন, মোড়কীকরণ সবকিছুই হয় তাদের চাহিদামতো এবং এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে প্রায় চল্লিশ লক্ষেরও বেশি জনবল যারা কায়িক এবং মানসিক শ্রম দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনায় সার্বক্ষণিক চেষ্টা করছে এবং নিজেদের পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে প্রতিনিয়ত। যারা আমাদের দেশ থেকে তৈরি পোশাক কিনছেন তারা হচ্ছেন বায়ার (ক্রেতা)। তারা বাংলাদেশ থেকে কেনার পূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানকে কিছু চাহিদা পূরণের জন্য বলেন, যাকে বলা হয় বায়ার সিওসি বা বায়ার আচরণবিধি। তার সাথে আছে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং কোম্পানির নিজস্ব কিছু নীতিমালা। এই সবগুলো নীতিমালাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য যে বিভাগটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই বিভাগটির নাম কমপ্লায়েন্স। পোশাকশিল্পের প্রধান কাজ শুরু হয় কাটিং থেকে, ফিনিশিংয়ে গিয়ে কাজ শেষ। আর এই সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্পন্ন করতে রয়েছে কয়েকটি বিভাগ-মার্চেন্ডাইজিং, কমার্শিয়াল, একাউন্টস, স্টোর, মেইন্টেনেন্স, আরএন্ডডি, উৎপাদন এবং এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স।

কমপ্লায়েন্স এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ জুড়ে আছি আমরা ওয়েলফেয়ার অফিসাররা। এইটুকু বুঝতে পারলাম আমার দায়িত্ব অনেক। কারণ শ্রমিকের সকল প্রকারের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, চাহিদা, তাদের চাওয়া-পাওয়া সবকিছু সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে ওয়েলফেয়ারের ভূমিকা অনেক। দেখতে দেখতে একমাস অতিবাহিত করলাম। অনেক কিছু জানতে শুরু করলাম এবং খুব ভালো লাগতে লাগল। প্রতিদিন ফ্লোর ভিজিট করতে গিয়ে শ্রমিকদের সাথে কথা বলতাম আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের একান্ত কাছে থেকে তাদের ভিতরকার বিভিন্ন সমস্যা জানার চেষ্টা করতাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওরা খুব আপন করে নিল আমাকে। আমিও প্রাণপন চেষ্টা করতাম ওদের জন্য কিছু করার। এইভাবে চলছে আমার ওয়েলফেয়ার হিসেবে শ্রমিকের এবং কর্তৃপক্ষের খুব কাছাকাছি থেকে তাদের সমস্যা এবং চাহিদা সম্পর্কে জেনে সমাধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রয়াস। আর এই কাজটি যে এত সহজ নয় চাকরির বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করতে

থাকি প্রতি মুহূর্তে।

যতই কমপ্লায়েন্স কিংবা বিভিন্ন নিয়ম-কানুন থাকুক না কেন গার্মেন্টস এর কলকাঠি শুধুমাত্র উৎপাদনের হাতে। শ্রমিকের জন্য যুক্তিসংগত কোনো অধিকার আদায়ের প্রশ্ন আসলেও উৎপাদনের সাথে জড়িতরা সেখানে কোনো না কোনো সমস্যা খুঁজে বের করে, সবসময় ওয়েলফেয়ারদের তাদের শত্রু মনে না করলেও বন্ধু ভাবার মতো সহজ কাজটি তারা করতে চান না। ওয়েলফেয়ার অফিসার মানেই হলো তাদের আতঙ্ক। ফ্লোরে গিয়ে যখন কোনো শ্রমিকের সাথে কথা বলছি তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এসে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কী কথা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনে। কখনো ম্যানেজার নিজে অথবা কখনো সুপারভাইজার পাশে এসে দেখানো ভদ্রতাসুলভ আচরণে প্রশ্ন করে– ম্যাডাম কোনো সমস্যা? মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে জবাব দেই- চোরের মন পুলিশ পুলিশ। তবে তাদেরকেই বা কী বলব সারাদিন যে পরিমান উৎপাদনের ধান্দায় তাদের দৌড়াতে হয়, নির্দিষ্ট টার্গেট পূরণ করতে তাদেরকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, জবাবদিহিতার শৃঙ্খলে জর্জরিত হতে হয় প্রতিনিয়ত তাতে স্বাভাবিকভাবেই তারা একটু রুক্ষ মেজাজের হয়ে যায়। তারপরও একজন ওয়েলফেয়ার হিসেবে আমার দায়িত্ব থেকে তো আমি আর সরে আসতে পারি না, তাই অনেক কিছু সহ্য করে হলেও এই দায়িত্বটি পালন করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত...

মজার ব্যাপার হলো যখন ফ্লোর ম্যানেজমেন্টের কথা শুনতে যাই, শ্রমিকরা বলে ম্যাডামরা কিছুই পারে না, আর যখন শ্রমিকদের কথা চিন্তা করতে যাই ফ্লোর ম্যানেজমেন্টকে তখন ম্যানেজ করাটা হয়ে পড়ে মুশকিল। শ্রমিকরা মনে করে ওয়েলফেয়ার ম্যাডামরা সব পারেন, তাই তাদের যত সুখ-দুঃখ, সুযোগ-সুবিধা, চাওয়া-পাওয়া সব আবদার আমাদের কাছে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে এখনো ঐভাবে কমপ্লায়েন্স ইমপ্লিমেন্ট হয়নি, তাই সকলের স্বার্থে অনেক কিছুই ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাই। এতে করে নিজের আদর্শের কাছে খুব ছোট হয়ে যাই তবু কিছু করার থাকলেও করতে পারি না... কারণ একটা জায়গায় সবাই ধরা। অনেক সময় মুখ বুঝে যখন সবকিছু সহ্য করতে হয় তখন শুনতে হয় ওয়েলফেয়ার নয় অয়েল (তেল) ফেয়ার। ওয়েলফেয়াররা নাকি তেল মারে। নিরবে শুনে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকে না তখন, অথচ একটি ফ্যাক্টরির শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে সু-সম্পর্ক তৈরি এবং সুস্থ্য-সুন্দর কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি আমরা ওয়েলফেয়াররা। এই শিল্পের সাথে জড়িত অন্যরা এই নিয়ে হয়তো ভাবেই না।

অনেকের ধারণা ওয়েলফেয়ারদের কাজ কী? সারাদিন ফ্লোরে ঘুরে বেড়ায়, চেয়ারে বসে থাকে, মাঝে মাঝে হয়রানী- অভিযোগের ভুয়া সমাধান করে... কিন্তু যদি বুঝাতে পারতাম এটা করতেও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। শ্রমিকদের সব বিষয়ে ম্যানেজ করতে পারার মতো পারদর্শিতা কেবল আমরাই দেখাই। সকালবেলা এসেই অনুপস্থিত শ্রমিকদের সাথে কথা বলা, ফ্লোরে গিয়ে হাউজকিপিং ঠিক করা, শ্রমিকদের সাথে কথা বলা, তাদের সমস্যা জানা

ও সমাধানের ব্যবস্থা করা, অভিযোগ শোনা ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ কাজ নয়। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা শোনার জন্য শ্রমিকদের মধ্য থেকেই গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন কমিটি যেমন- অংশগ্রহণ কমিটি, সেফটি কমিটি, অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি ইত্যাদি। এগুলোকে কার্যকরী করতে কাজ করতে হয় প্রতিনিয়ত। শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ করানো, গেটের নিরাপত্তারক্ষী থেকে শুরু করে লোডার পর্যন্ত সবাইকে জানাতে হয় শ্রম আইন ও বায়ার নীতিমালার বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে। কোনো শ্রমিক নির্দিষ্ট উৎপাদনে সক্ষম হলেও মাঝে মাঝে তা দিতে চায় না, এই নিয়ে সুপারভাইজার আর ম্যানেজারের মধ্যে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। তখন সরেজমিনে গিয়ে শ্রমিককে বুঝাতে হয়, আর এই বুঝানোর কাজটা করতে গেলে উভয় পক্ষের সাথে বলতে হয় নানা কথা। একবার শ্রমিককে বুঝাও আবার ফ্লোর ম্যানেজমেন্টকে বুঝাও... কত কথা যে বলতে হয় সারাদিন... তবুও অনেকের রক্তচক্ষুর শিকার আমাদেরই হতে হয়। কোনো পরামর্শ দিতে চাইলে বলে- তোমরা কী বুঝ? আর কোনো সমস্যা হলে শুনতে হয় ওয়েলফেয়াররা কী করছে? আমাদের কথা শোনার কেউ নেই...

যাইহোক.....আল মুসলিম, ডেকো এবং বর্তমানে ব্যাবিলনে অনেক কিছু শিখেছি, জেনেছি, সহ্য করেছি নানা ঘাত-প্রতিঘাত। তবুও আমার কাজকে আমি ভালোবাসি, আমার অবস্থানকে আমি সম্মান করি। এতকিছুর পরেও যখন দেখি আমার মুখে হাসি না থাকলে একজন শ্রমিক জানতে চায়- ম্যাডাম মন খারাপ? তখনই মনে হয় আমি এখানেই স্বার্থক। শ্রমিকদের কোম্পানির পক্ষ থেকে যখন কোনো সুবিধা দেয়া হয় ওরা মনে করে এটা আমাদের জন্যই পেয়েছে। অনেক দোয়া করে ওরা আমাদের জন্য। এটাই পাওয়া। গর্ব করে বলতে পারি রাস্তায় বের হলে একজন ম্যানেজারের চাইতে বেশি সম্মান পাই আমরা। মজার ব্যাপার হলো- বাস কিংবা অটোরিক্সার ড্রাইভার পর্যন্ত কীভাবে যেন চিনতে পারে, মাঝে মাঝে ভাড়া নিতে চায় না, রাস্তায় কিংবা যেখানেই দেখা হোক মিষ্টি হাসি দিয়ে জানতে চায় ম্যাডাম ভালো আছেন? ভালোই লাগে। আব্বা বলেন- চাকরি করতে গেলে অনেক কিছু মোকাবেলা করতে হয়, সবকিছু মেনে নিয়ে কাজকে ভালোবাসাই হলো প্রকৃত সুখ, প্রশান্তি।

আমার ছোটবেলার স্বপ্ন কিছুটা হলেও এই কাজের মাধ্যমে পূরণ হচ্ছে... এটাই বা কম কিসে!

# ডায়াবেটিস– একটি মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির নাম

ডাঃ আসমা আক্তার
মেডিক্যাল অফিসার
ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস

১১

ডায়াবেটিস শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Diabainein থেকে। সর্বপ্রথম ১৪২৫ সালে Thomas Willis ডায়াবেটিস সম্পর্কে মেডিক্যাল বইতে লেখেন। মনে রাখবেন, খাবারের অতিরিক্ত লোভ এবং আলস্য এই রোগকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনতে পারে।

Diet, Drug and Discipline এই তিনটি শব্দ মনে রাখলেই আপনি ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা পেতে পারেন। অগ্নাশয় যদি যথেষ্ট ইনসুলিন তৈরি করতে না পারে অথবা শরীর যদি উৎপন্ন ইনসুলিন তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে যে রোগ হয় তা হলো ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ।

## ডায়াবেটিস দুই ধরনের–

১. ডায়াবেটিস মেলাইটাস-১
২. ডায়াবেটিস মেলাইটাস-২

## ডায়াবেটিস মেলাইটাস-১

স্বয়ং অগ্নাশয় নিজে অসুস্থ্য হয়ে ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না, যে কারণে বাহির থেকে আজীবন ইনসুলিন দিয়ে যেতে হয়। বেশিরভাগ সময় এই সমস্যা শিশু অবস্থা থেকেই তৈরি হয়– যাকে ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিস বলে।

## ডায়াবেটিস মেলাইটাস-২

শরীর পর্যাপ্ত পরিমান ইনসুলিন তৈরিতে ব্যর্থ হয় অথবা পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি হলেও ইনসুলিন তার কাজ করতে পারে না। সাধারণত ৪০ বৎসর বয়সের বেশি লোকদের এটা হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত প্রধানত বংশগত কারণই এর জন্য বেশি দায়ী। এছাড়া যাদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এবং যারা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন না, তাদের বেলায়ও দেখা যায়। এক্ষেত্রে, খাদ্যাভ্যাস কিছুটা পরিবর্তন, ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বেশি ভূমিকা রাখে।

ডায়াবেটিস যে কারণে হয়–

১. বংশগত কারণে
২. ভাইরাল ইনফেকশনজনিত কারণে
৩. অটো ইমিউন
৪. শারীরিক পরিশ্রম না করার কারণে
৫. গর্ভাবস্থায় ধুমপান করলে
৬. জন্মের পর শিশুকে গরুর দুধ খাওয়ালে
৭. বেশি বেশি ফাস্ট ফুড খেলে
৮. টেনশনজনিত কারণে।

ডায়াবেটিসের জটিলতা

১. কম বয়সে ডায়াবেটিস ধরা পড়লে
২. অনেক দেরিতে ডায়াবেটিস ধরা পড়লে
৩. দীর্ঘকাল ডায়াবেটিসে ভুগলে
৪. ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে
৫. খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন না করলে
৬. রক্তে কোলেস্টেরল বাড়লে, রক্তচাপ বাড়লে, দৈহিক ওজন বেড়ে গেলে, বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ধুমপান করলে ডায়াবেটিস জটিলতা দেখা দেয়।

ডায়াবেটিস যেসব অঙ্গের ক্ষতি করে

কমবেশি সকল অঙ্গের ক্ষতি হয়, তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিডনি, হার্ট, চোখ, শরীরের চামড়া, দাঁতের মাড়ি, স্নায়ু এবং ধমনীসমূহ। এছাড়াও যৌন উত্তেজনা হ্রাসসহ নানাবিধ স্বাস্থ্যহানীর জন্য ডায়াবেটিস দায়ী।

কেন অতিরিক্ত ওজন বা মেদ বাড়লে ডায়াবেটিস হয়ে যেতে পারে

শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার খেলে খাবারের বেশি অংশটুকু চর্বি আকারে জমতে থাকে। সেই চর্বি হার্টে রক্ত সাপ্লাই দিতে অনেক সমস্যা করে। অন্যদিকে উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়ায় অতিরিক্ত গ্লুকোজ তৈরি হয় বিধায় অতিরিক্ত ইনসুলিনের দরকার হয়। তাই হালকা ও মধ্যম ধরণের খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

ডায়াবেটিস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়ে অন্যান্য অসুখের সাথে যুক্ত হয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্য জটিলতা সৃষ্টি করে।

## ডায়াবেটিসের লক্ষণ

মনে রাখবেন যে কয়টি অসুখ মানুষের দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তির সৃষ্টি করে তার মধ্যে ডায়াবেটিস অন্যতম। রাতে ঘুম ভেঙে প্রশ্রাবের প্রবণতা, খুব বেশি পিপাসা লাগা, বেশি ক্ষুধা পাওয়া, যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া, ক্লান্তি ও দুর্বলতাবোধ করা, ক্ষত বা ঘা শুকাতে দেরি হওয়া, খোস-পাচড়া, চর্মরোগ প্রভৃতি দেখা দেয়া, মাথা ঘোরা, কোনো কাজে উৎসাহ না পাওয়া, যৌনক্ষমতা ক্রমেই কমে যাওয়া, মহিলাদের মাসিকের গোলমাল, কারো কারো শ্বাসে ফলের গন্ধ ও বদ মেজাজ, কারো কারো দুর্বলতা এত বেশি হয় যে, কোনো ভারী বা বাড়তি কাজকর্ম ছাড়াই ক্লান্ত হয়ে যাওয়া।

## ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হলে কী কী বিপদ হতে পারে

১. পক্ষাঘাত
২. স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা ও হৃদরোগ
৩. পায়ে পচনশীল ক্ষত
৪. চক্ষুরোগ
৫. মূত্রাশয়ের রোগ
৬. প্রশ্রাবে আমিষ বের হওয়া
৭. পাতলা পায়খানা
৮. মাড়ির প্রদাহ
৯. চুলকানি
১০. মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি ওজনের বাচ্চার জন্ম
১১. জন্মের পর পরই শিশু মৃত্যু
১২. যৌন ক্ষমতা কমে যাওয়া, ইত্যাদি।

## সনাক্তকরণ

খালি পেটে যদি চিনির মাত্রা ৫.৮ এর বেশি কিন্তু ৭.৮ মিলি এর কম হয় তবে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি আছে মনে করবেন– যাকে প্রি ডায়াবেটিস হিসাবে ধরা হয়– যা ঘরে বসে গ্লুকোমিটারের মাধ্যমে দেখতে পারেন।

## চিকিৎসা

### ডায়াবেটিস মেলাইটাস-১

যাদের শরীরে ইনসুলিন হরমোন তৈরি বন্ধ হয়ে গেছে তাদের সারাজীবন কম বেশি ইনসুলিন নিতে হবে। তবে ইনসুলিনের মাত্রা কম-বেশি নির্ভর করবে খাদ্যাভ্যাস ও চলাচলের উপর। ইনসুলিনই ডায়াবেটিস মেলাইটাস-১ এর একমাত্র চিকিৎসা।

ডায়াবেটিস মেলাইটাস-২

যাদের ইনসুলিন তৈরি হয় কিন্তু ঠিকমতো বন্টন হয় না তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ট্যাবলেট খেতে হবে। খাদ্যাভ্যাস ঠিকমতো মেনে চললে আর বাড়তি ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে গ্লুকোজের পরিমানের উপর নির্ভর করবে আপনার সরাসরি ইনসুলিন ইনজেকশন লাগবে কি না।

## উপদেশ

খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত ব্যায়াম ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়। যেসব খাবারে ক্যালরি কম থাকে যেমন শাক-সবজি, টক ফল, শসা ইত্যাদি আঁশবহুল খাবার বেশি পরিমান খাওয়া উচিত। ভাতে ক্যালরির পরিমান বেশি থাকায় যতটুকু সম্ভব কম পরিমান ভাত খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে রাতের বেলায়, কারণ এ সময় শারীরিক পরিশ্রম কম হয়, গ্লুকোজের রিজার্ভ বেড়ে যায়। তাই ভাত বা আটা দিয়ে তৈরি খাবার, মিষ্টি ফল পরিমান মতো খাবেন। ভাতের চাইতে আলুতে ক্যালরি কম থাকে। সরাসরি মিষ্টি বা চিনি জাতীয় খাবার বন্ধ করে দিতে হবে।

## ব্যায়াম

ব্যায়াম করলে শরীরে থাকা ইনসুলিন এর কার্যকারিতা ও নিঃসরণের পরিমান বেড়ে যায়। প্রতিদিন পয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করতে হবে।

নিয়ম মেনে চলুন। সুস্থ্য থাকুন। ভালো থাকুন।

# মোল্লা ফারুক এবং ভূতের গল্প

হাসান মোঃ আশরাফুল হক
সহকারী ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আজকে জ্বীন নামানো হবে, কী মজার ব্যাপার তাই না? মোল্লা ফারুক খুব কামেল লোক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, মাথায় টুপি, চোখে সুরমা লাগায় সব সময়। আমরা যখন দুষ্টামি করি মোল্লা তখন তসবি জপে। তাই মোল্লা যখন বলল জ্বীন নামাতে পারবে আমরা কিন্তু বিশ্বাস না করে পারিনি। কয়েকদিন থেকেই আমরা খুবই উত্তেজিত। অপেক্ষার সময়টুকু আর যাচ্ছেই না। এই যেমন কলেজ শেষ করে আমরা যেন উড়ে চলে এসেছি। বাংলা স্যারের ক্লাস আছে কিন্তু স্যারের ক্লাস করার চেয়ে জ্বীন নামানোর যোগাড়যন্ত দেখার মজাটা বেশি হবে বলেই ধারণা করলাম।

আমাদের কলেজটা অজপাড়া গাঁয়ে। রাত ৯টা মানে ভূত ছাড়া হোস্টেলের আশেপাশে সব ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু যারা রাত জেগে পড়াশুনা করে তারা দল বেঁধে ১০টার দিকে বাজারে যায় চা খেতে। আমাদের হোস্টেলটা এল সিস্টেমের। প্রতি রুমে আমরা চারজন করে থাকি। মোট সাত রুমে আটাশ জন। হোস্টেলের ঠিক সামনেই একটা বিশাল পুকুর, রাতে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসে, সে জন্য আমরা কেউ রাতে পুকুরের আশেপাশে যাই না। এমনকি টয়লেটে যাবার সময়ও দুইজন একসাথে যাই। ঘটনার সূত্রপাত মোল্লার সাথে দুষ্টামি করতে যেয়ে। ওকে এত খেপাচ্ছিলাম দেখে ওর যে জ্বীন নামানোর ক্ষমতা আছে তা জানিয়ে দিলো। আমরাতো হেসেই উড়িয়ে দিলাম কিন্তু মোল্লা যে কসম খেয়ে বসল! শেষে বিশ্বাস করতে হলো কিন্তু আমরাও শর্ত দিলাম আজই আমাদের জ্বীন নামিয়ে দেখাতে হবে। সবার চাপাচাপিতে শেষে আগামিকাল দিন ঠিক হলো। সবার উত্তেজনা তখন থেকেই শুরু।

মোল্লা তার শর্তগুলো জানাল এবং বলে দিলো যে কেউ যদি শর্ত পালন না করে তবে তার ভীষণ ক্ষতি হবে। আরও জানাল জ্বীন দেখতে খুব ভয়ংকর এবং মনের কথা বুঝতে পারে। কেউ যদি মনে খারাপ চিন্তা নিয়ে জ্বীন দেখতে যায় তবে তার কিছু হলে মোল্লা দায়ী থাকবে না। যাদের হার্ট দুর্বল তাদেরও জ্বীন দেখতে যেতে নিষেধ করে দিলো। আমরা আলোচনায় বসে ১৫ জন জ্বীন দেখতে যাবো বলে ঠিক করলাম। কেউ ভয় পেয়েছে আবার কেউ ভুয়া

বলে দেখতে আসবে না বলে ঠিক করল। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম ওরাও ভয়ে আসতে চাচ্ছে না, ভয় পেয়েছে বললে তো মান-সম্মান থাকে না! মোল্লা যেসকল শর্ত দিয়েছিল তা নিম্নরূপ–

১। পরিষ্কার জামা কাপড় পরতে হবে
২। সবাইকে এশার নামায পড়তে হবে
৩। সবাইকে এক রুমে বসতে হবে
৪। রুমে আসার পর কেউ রুম থেকে বের হতে পারবে না
৫। সাথে কোনো লাইট আনতে পারবে না
৬। কোনো কথা বলা যাবে না, মোবাইল ফোন আনা যাবে না
৭। মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর নাম জপতে হবে।

শর্তগুলোতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, আমাদের স্বাভাবিকই মনে হয়েছে। রিয়াদকে একটু বেশি উৎসাহী মনে হচ্ছে, ও সরাসরি মোল্লার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেল। এখন বিকালবেলা আমরা সবাই বসে আছি কখন সন্ধ্যা হবে। মোল্লা ও রিয়াদ বাজারে গেল জ্বীন নামানোর জিনিস কিনতে। সন্ধ্যা যখন ছুঁই ছুঁই মোল্লা ও রিয়াদ ফিরে এল। আমাদের সাথে কোনো কথা না বলে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। আজ আবার বাতাসও নাই, কেমন নিস্তব্ধ একটা বিকাল। রুম থেকে ততক্ষণে ঘড়ঘড় একটা শব্দ আমাদের কানে এল। মনে হলো কেউ যেন শিলপাটাতে কিছু একটা ঘসছে। জ্বীন আসলে নাকি শব্দ করে আসে, এটা কী সেরকম কোনো শব্দ কি না বুঝতে পারলাম না। মোল্লা কি তবে এখনই জ্বীন নামিয়ে আনল নাকি! আমরা দরজার পাশে যেয়ে কান পাতলাম, কিন্তু ঐ ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা চলে এলাম। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, তবুও মোল্লা বের হলো না। আমরাও আস্তে আস্তে পড়তে চলে গেলাম। মোল্লা যখন বের হয়ে বলল যে ওর প্রস্তুতি শেষ, তখন এশার ওয়াক্ত হয়ে গেছে। মোল্লার চোখে খুশির ঝিলিক আর রিয়াদের হাসি কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো। বিষয়টা কেমন মনে হলেও জ্বীন আসবে শুনে তেমন একটা পাত্তা দিলাম না। মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিলাম জ্বীন আসলে কেমন করে জ্বীনের মোকাবিলা করব। এশার আজান দিলে আমরা নামাজ পড়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। শেষ সময়ে আরও দুইজন কমে গেল। আমরা ১৩জন, সাথে মোল্লা ও রিয়াদসহ ১৫জন রুমে প্রবেশ করলাম। রিয়াদ দরজা বন্ধ করে দিলো। আমাদের সবাইকে চেক করে দেখল সাথে লাইট বা মোবাইল আছে কি না, যদিও ঐ সময়ে আমাদের হোস্টেলে ২/৩জনের মাত্র মোবাইল ফোন ছিল। সন্তুষ্ট হবার পর আমাদের সবাইকে গোল হয়ে বসতে বলল। মোল্লা আর রিয়াদকে দেখলাম পাঞ্জাবী ও টুপি পরে আছে। যাদের অজু আছে তাদের বসতে বলল আর যাদের নাই তাদেরকে চলে যেতে বলল। আমরা নিশ্চিত করলাম আমাদের সবাই নামাজ ও অজু করে এসেছি। আমরা গোল হয়ে বসার পর মোল্লা আস্তে আস্তে ব্যাখ্যা করল আমাদের কী করতে হবে। লাইট নিভিয়ে দেয়া হবে, আমাদের কয়েকটা সুরার কথা বলল যেটা পড়তে হবে। সুরা পড়া শেষ হলে

মোল্লা কিছু জিকির করবে, আমাদেরও সাথে সাথে উচ্চ শব্দে পড়তে হবে। জিকির করা শেষ হলে আমাদের মোল্লার বড় হুজুরের দেয়া তেল পড়া মুখে মাখতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে যত ভালোভাবে মুখে পড়া তেল মাখতে পারবে, সে তত ভালো করে জ্বীন দেখতে পাবে এবং তার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে কেউ যদি জ্বীন এর সাথে বেয়াদবি করার চেষ্টা করে বা মনে কোনো খারাপ চিন্তা থাকে, তার কোনো ক্ষতি জ্বীন করলে তার জন্য কেউ দায়ী থাকবে না। জ্বীন যখন আসবে তখন আশেপাশে অনেক শব্দ হবে, আমরা যেন ভয় পেয়ে চিৎকার না করি, ভয় পেলে জ্বীন তার উপর রাগ করে ক্ষতি করতে পারে। আমরা ভয়ে ভয়ে রাজি হয়ে গোল হয়ে বসে গেলাম। রিয়াদ লাইট নিভিয়ে দিয়ে দরজার পাশে আমাদের সাথে গোল হয়ে বসে গেল।

মোল্লা আস্তে আস্তে তার সুরা পড়া শুরু করল, আমরাও মনে মনে পড়তে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর মোল্লা আমাদের জিকির করতে বলল। মোল্লা শুরু করলে আমরাও মোল্লার সাথে উচ্চস্বরে জিকির করতে লাগলাম। জিকিরের মাঝেই মোল্লা আমাদের তেল মাখতে বলল। আমরাও তেল মাখা শুরু করলাম। ভালো করে জ্বীন দেখার লোভে আমরা বেশি করে ঘষে ঘষে সারামুখে তেল লাগালাম। গন্ধটা মনে হলো যেন সরিষার তেলের মতো সাথে কিছু একটা মিশানো আছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। অত পাত্তাও অবশ্য দেইনি, জ্বীন দেখা নিয়ে কথা। মাথায় তখন শুধু ছিল মুখের কোনো অংশ যেন বাদ না যায় তেল মাখা থেকে। মিনিট পাঁচেক পর থেকে মনে হলো বাতাসের শব্দ শুনতে পেলাম। সাথে টিনের চালে কে যেন ঢিল মারতে লাগল। আমরাতো ভয়ে অস্থির, কেউ কেউ আবার ভয়ে কাঁদা শুরু করল, কেউ চিৎকার করতে লাগল। আমরা যত চিৎকার করি, বাইরে বাতাসের শব্দ ও টিনের চালে ঢিলের শব্দ তত বাড়তে থাকে। মোল্লা তখন চিৎকার করে আমাদের শান্ত হয়ে থাকতে বলল। কে শুনে তখন কার কথা, চিৎকার বাড়তেই থাকল। কেউ কেউ বলল ওরা জ্বীন দেখবে না। মোল্লা তখন বিকট একটা শব্দ করে, আরবিতে কিছু একটা বলল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম আস্তে আস্তে ঢিলের শব্দ কমতে কমতে একবারে নাই হয়ে গেল। ততক্ষণে আশেপাশের বাড়ির মানুষজনও মনে হয় চলে এসেছে।

হঠাৎ করে কেউ একজন লাইট জ্বেলে দিলো। আমরা অবাক হয়ে দেখতে পেলাম অনেকগুলো জ্বীন আমাদের সাথে বসে আছে। মোল্লা এবং রিয়াদ বাদে আমরা ১৩টা জ্বীন মুখে সরিষার তেল ও কয়লার কালি মেখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছি। জ্বীন আমরা ঠিকই দেখলাম, আমরা ১৩জন বোকা জ্বীন...

# Evolution of Social Compliance in Apparel Industry

Mohammad Hasan
Executive Director
Babylon Group

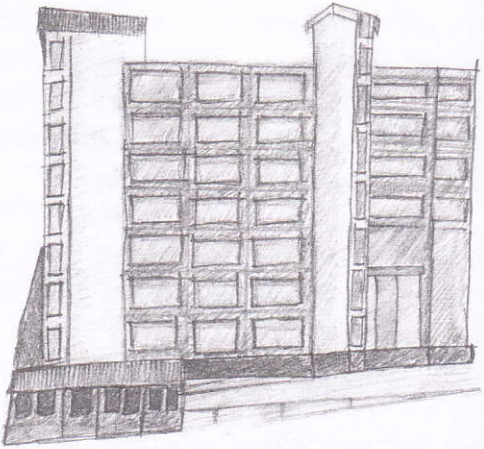

Every sector has to maintain certain rules and regulations set by the government according to the nature of the business. Manufacturing RMG, as a strong link of global supply chain, must not avoid those rules andregulations. Social compliance delivers the shared benefits to all stakeholders along the value chain. The practice of ethical business ensures business continuity of suppliers, generate goodwill for the brands, and create awareness among the workers. Social compliance, an integral part of manufacturing business is mainly liked with supply chain, especially with the international market , is not directly involved with product but it creates value for the product. Social compliance has both regulatory and voluntary contexts. The term social compliance also refers to ethical, legal compliance which upholds the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, the elimination of all forms of forced and compulsory labor, the effective abolition of child labor, and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Workers, work condition, ethical practices, environment are the areas of major concerned of compliance.

There is a historical relationship between sewing machine operation and exploitation along with long working hours and child labor. At the very outset of technological advancement during the 18th century, any innovation in textiles and apparel sector used to face workers' protest as they feared they would lose job. Having proved their fear to be wrong, the machines actually have created millions of jobs. Textiles & apparel was the pioneer industry at the era of industrial revolution. This particular industry

was the startup industry in many of developed countries. During 1850, the sewing machine really took off as a worldwide means of production. Karl Marx (1818 - 1883) viewed the sewing machines as, the 'decisively revolutionary machine' Coffin, (1999) in connection of sewing machine's role, from its beginnings, shaping global capitalism. These machines overthrew existing social mode of production and it transformed the role of women in industry. It created a revolution in consumption, established supply chain system among the manufacturers in developing and least developing countries to the retailers in developed countries. Historically, in the production transformation process, from Agrarian to Industrial, this industry contributed highest employment generation. Unfortunately, at any age, this transformation of labor-intensive sector did not ensure job security, working environment - working hours, safety, fair payment etc. Rather recruitment of child labor, wage discrimination, exploitation etc were common practices throughout the industry both in developed and developing countries. Maximization of profit by the sellers and manufacturers always tended to exploit the workers, the core element of the production.

Famous assertion of the medieval Bengali poet Baru Chandidas "Shobar upor manush shotto tahar upore nai" (Above all is humanity, none else) in his composition titled "Bhakti", and historical quotation from Florance Kelley First General Secretary, National Consumers League NCL), America's oldest consumer organization, representing consumers and workers on marketplace and workplace issues since its founding in 1899 to protect and promote social and economic justice for consumers and workers in the United States and abroad during progressive era (1890 - 1920) "To live means to buy, to buy means to have power, to have power means to have duties" can be considered the basic essence of social compliance. Later on many different international organizations (like International Labor Organization (ILO) conventions on labor rights & standard, United Nations (UN) universal declaration on human rights, World Trade Organization (WTO) agenda on work place standard, Anti-sweatshop movement, Clean Cloth Campaign etc echoed the dignity of human.

The industrial Revolution changed the social power structure, culture and human behavior. The Industrial Revolution also had a profound impact on the human population. During the period the rate of population growth

was almost double, which is contrary to the effect of invention of machine power in industrial production process that decreased the manpower demand. Increasing population with machine backed production made the workers worry about their job security. Employers, except a few, took every opportunity of the situation. To the first generation workers, having an employment was more important than no job. Working condition and environment were not an issue to be considered by the employers. The following chronological events can be identified for the evolution of social compliance.

**The end of Feudalism (1500 - 1861)**

During the period of Feudalism, a system for structuring society around relationships derived from the holding of land in exchange for service or labor. Medieval feudal economy lasted from 9th to 15th century. Marl Marx (1818 - 1883) who describes the system, Feudalism, from political and economic points, views it as the economic situation coming before the rise of capitalism or which is most widely known as mercantilism. He defined feudalism as the power of the ruling class (the aristocracy) rested on their control of arable land, leading to a class of society based upon the exploitation of the peasants who used to farm these lands, typically under serfdom. The social compliance of that time was, the system disappeared, the peasants got their land free, from most of Western Europe in about 1500, from central and Eastern Europe by 1850s, in Russia serfdom was finally abolished in1861.

**Family based Cottage Industry in Bangladesh**

In Bangladesh the history of cottage industry is very old. "Among the cottage industries of Bengal, cotton is the most important, and has a history of at least two thousand years. During Roman times, the muslin of Eastern Bengal was a passion and a fashion for the elegant Roman ladies. One of the striking characteristics of Bengal's handloom cotton textile and silk industry was their exceptional diffusion throughout the country" (Tasneem and Biswas, 2014, p-1). This small but independent, women led activities with no cost based production system was carried out with the help of their own family members. "Non-professional forms like those accomplished by women (needlework for instance), was practiced during 'off seasons', such as periods of the years, when there is less work available in the agricultural sector (e.g. monsoons), or 'off time' (i.e. - 'moments in time', of the 'every day routine', one has 'stolen or earned'), to 'do or

indulge' in this activity of leisure and creativity. This activity of 'one's own choice' is not dictated by external demands - or the 'sansarerkaaj', or 'worldly activities', as many a woman say in Bengali" (Kumar, 2006 p.1). During the Mughal rule in Bengal, Cottage industry used to be patronized by the government. Initially the European merchants and companies, from Britain and Holland, and the East India Company, financed the weaver and artisans, and other handicraft makers for producing goods of export quality" (Reza, 2012, p-1). Though this sector was a very informal and it had child labour in it; still it was not exploitative. The children and women were safe with an informal existence of compliance. It was one of the salient features of the family based small cottage industry.

**The Industrial Revolution (1760 - 1840)**

The Industrial Revolution began in Great Britain and spread to Western Europe and the United States within a few decades. It was the transition to new manufacturing processes in the period from about 1760 to sometimes between 1820 and 1840. The First Industrial Revolution evolved into the Second Industrial Revolution in the transition years between 1840 and 1870.

The Industrial Revolution and regulation to monitor new industries did not happen simultaneously. Employment generation for the increasing population was the main challenge of that time. People in large number came to the towns from the countryside for job as the rate of unemployment was getting high to higher in the first phases of the Industrial Revolution. With the huge scarcity of employment, for the first generation of workers-from the 1790s to the 1840s, workers who were around 80% of total number of the people had very limited or no power to bargain with their new employers on wages, work hours, or working conditions. Working conditions were very tough, unbearable and tragic - 10 to 14 working hours a day, six days a week, no safety hazards, no paid vacation or holidays, no financial compensation for any injury, and of course no time and opportunity for recreation. Rather the owners used to fine the workers who left or remained absent from their jobs to ensure uninterrupted work-flow in the factories.

**The French Revolution (1789 - 1799)**

The French revolution, major changes in social and political system in France, is regarded as one of the most important events in human

history. The revolution took place in different stages, which had started from 1789 and continued till 1799. The National Constituent Assembly abolished feudalism on the night of 4 August 1789.the Assembly published the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen on 26th August 1789 that comprised a statement of principles instead of a constitution with legal effect. Writing the first constitution (French Constitution of 1791) was the most important outcome of the revolution. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789 is a fundamental document of the French Revolution and in the history of human rights. The declaration inspired the United Nations Universal Declaration of Human Rights significantly.

**Utopian socialism (First quarter of the 19th century)**

The term "Utopian socialism" was introduced by Karl Marx and Friedrich Engels in "The Communist Manifesto" in 1848 that was made clear in Engels' work, "Socialism: Utopian and Scientific" in 1892. It is Utopian socialism that is often described as the presentation of visions and outlines of futuristic ideal societies, having the positive ideals being the main reason for moving society in such a direction. Wikipedia, the free encyclopedia, (2015). The three principal utopian socialists were the Frenchmen Henri de Saint-Simon (1760-1825) and Charles Fourier (1772-1837) and the British factory owner Robert Owen (1771-1858) who turned themselves as social and industrial reformer and changed the traditional approach to the employees. Child labor, working hours and many welfare programs towards the employees gave them recognition as the advocate of utopian socialism. Robert Owen raised the demand for a ten-hour day in 1810, and instituted it in his socialist enterprise at New Lanark. He had formulated the goal of eight-hour day by 1817 coining the slogan "Eight hours labor, Eight hours recreation, Eight hours rest"

**American Civil War (1861 - 1865)**

The much hated slavery system was practiced throughout American colonies in the 17th and 18th centuries. Though slaves were initially used in production of lucrative crops like tobacco but the invention of cotton gin in 1793 solidified the central importance of slavery. England textile industry was highly dependent on American cotton. As cheaper source of labor African slaves were used in the agriculture and industrial sector. In 1860, there were 4 million slaves in the US, some 60% of whom worked in cotton. American civil war, from 1861 to 1865, had its origin on the issues

of slavery. After four years of combat that left over 600,000 soldiers dead and many infrastructure destroyed, slavery was finally abolished. So the compliance of that period was to make slavery free workplace.

**International Labor Day, 1886**

There is no history that tells of achievement of rights by the employees without demand or demonstration. The eight-hour day or 40-hour week movement had its origins in the Industrial Revolution in Britain, during the late 18th and early 19th centuries. Women and children in England were first granted the ten-hour day in 1847. After the February revolution of 1848, French workers won the 12-hour day. The International Workingmen's Association took up the demand for an eight-hour day- the legal limitation of the working day, at its convention in Geneva in August 1866.In 1884 at the Chicago convention the Federation of Organized Trades and Labor Unions resolved that "eight hours shall constitute a day's legal labor from and after May 1, 1886." On May 3, 1886, workers movement turned into violence. The police arrived, opened fire, and killed four people, wounded many more. On May 4, at a subsequent rally, to protest this violence, a bomb exploded at the Haymarket Square. Hundreds of labor activists were rounded up and the prominent labor leaders arrested, tried, convicted, and executed. The International Workingmen's Association, meeting in Paris in 1889, endorsed the date for international demonstrations, thus starting the international tradition of May Day.

**International Labor Organization (ILO), 1919**

The concept of labor standards and social accountability in the business legitimated with the creation of the International Labor Organization (ILO). The ILO was one of the outcomes of Versailles treaty that ended the World War I to reflect the belief that universal and lasting peace can be accomplished only if it is based on social justice. The international labor movement demanding a comprehensive action during the World War I and protection for the working class, got an important attention by the international leaders after the World War I, as this very class had an active participation and support during the war.

The initial motivation was humanitarian, replacing exploitation and adverse working condition. Second, without an improvement in their condition, the workers would create social unrest. The third motivation was economic, a universal application of the system to create level playing field across the industries and countries. Simultaneous reform through the ILO would avoid

this problem. ILO, that turned a specialized agency of the United Nations in 1948, started its journey with the motto of "Promoting jobs, protecting people".

**United Nations' Universal Declaration on Human Rights (UDHR), 1948**

On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations (Bangladesh became the 136th member of United Nations on September 17, 1974) adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. This is one of the most important sources of economic, social and cultural rights. The declaration includes 30 articles to end all forms of exploitation, to ensure right to life, liberty and security, non-discrimination, and that human beings are equal in dignity and rights.

**Globalization and Revolution of Information Technology**

Information technology has made available the access of information worldwide. Sharing information and spirit of openness are helping to know wherever, whenever and whatever happens at the bottoms of the supply chain. Multinational Enterprises (MNEs) started sub-contracting the mass consumed product like RMG from developing countries to get the competitive advantage on production cost. This low wage priority did not get the attention of basic labor rights, welfare, working environment etc resulting in harsh criticism from the labor rights group, consumers in the host countries. When the wave of information technology (website, internet and social media) got momentum during 90s, this criticism turned to a big threat to business. The consumers started boycotting the products that was produced in a condition, which was hostile to the workers. Elimination of unethical business behavior and in response to pressure from consumers, manufacturing countries and human rights groups, and several international organizations developed ethical guidelines to address the conduct of MNEs. During '80s development of computer technology, economic globalization had emerged from a possibility to an undeniable fact and the main trend of the contemporary world. Wang (2004). In employment creation for the millions in countries with poor wages and eradication of extreme poverty the contributions of trade liberalization and globalization are immense. Unfortunately there is an opposite side of globalization i.e. a huge gap between the rich and the poor- unequal distribution of wealth.

**Anti-Sweatshop and Clean Cloth Campaign (CCC)**

The term Sweatshop originated in 1892, when American garment

workers began to speak up about heinous working conditions. Sweatshop is a manufacturing facility with low wages, available child workers, poor working condition, long working hours, violation or absence of labor law. Anti-Sweatshop refers to campaigning movements to improve the conditions of workers in manufacturing places characterized by low wages, poor working conditions and often child labor. People of the first world countries are now aware of sweatshop in third world countries by virtue of the revolution of information technology during '90s. United Students Against Sweatshops (USAS) was formed in 1997 to ensure greater justice and healthy working conditions for laborers especially in the third world who make their products. Nike - The world's best-selling US based brand sources its athletic shoes from Asian countries under sweatshop conditions. Campaigners call for boycotting Nike globally was so successful that in other leading sportswear brands including Adidas, Puma, Reebok and Timberland were compelled to adopt an ethical work place standard.

Another alliance for The Clean Clothes Campaign (CCC), formed in 1989 in the Netherlands, focuses on the improvement of working conditions in the garment and sportswear industries. The Clean Clothes Campaign insists that companies to bear a responsibility and have the power to ensure that workers throughout their supply chains are treated fairly. The CCC has developed a "Code of Labor Practices for the Apparel Industry Including Sportswear" in 1998 based upon the conventions of the United Nations' International Labor Organization followed by the basic labor conditions - wages, hours and working conditions.

**Formulation of Social Code of Conduct**

In the wave of globalization subcontracting and sourcing from low wage countries are common business models as chain of supply. Social codes of conduct are rules and guidelines imposed by buyers upon themselves and along their supply chains, both in response to consumers' pressure and as part of comprehensive marketing strategies aimed at improving their image. It is believed that it was the consumers who compelled the companies and brands to formulate their respective codes of conduct.

The first international code of conduct for multinationals was created by the International Chamber of Commerce (ICC) "Code of Standards of Advertising Practice" in 1937. In line with social accountability, multinational corporations developed their ethical guidelines in 1970s. During 1970s, The United Nations and OECD (Organization for Economic

Co-operation and Development), a unique forum of 30 countries developed the Code of Conduct (CoC) for Multinational Enterprises. Formal adaptation and practices of those codes by the multinational companies were not visible since they were voluntary and not legally binding. In the early 1970s, multinational enterprises (MNEs) were widely criticized for their behavior in developing countries as none of them considered human rights, labor rights, workplace safety. The codes remained merely a statement of principles in its earlier stage.

**The Apparel Industry Partnership (AIP) Initiative**

The concept of social compliance was developed and placed as a precondition in businesses by the American buyers first in the RMG manufacturing supply chain. Social Compliance is a set of standard on workers' rights and working condition along with environmental consideration. Law of the country, ILO conventions, UN declaration on human rights and international best practices are the principle of social compliance. It's a business driven program applied in the whole supply chain.

Mr. Richard Milhous Nixon, the 37th President of the United States from 1969 to 1974, introduced quota system under Multi Fiber Agreement (MFA). With this system manufacturing of readymade garments flourished in the least developed countries. To uphold labor rights and to eradicate sweatshops Mr William Jefferson "Bill" Clinton, 42nd President of the United States from 1993 to 2001 initiated the Apparel Industry Partnership (AIP) in August 1996 to ensure that products are manufactured under humane working conditions and to communicate that information to consumers. The 44th President of USA since 2008 has prioritized on cutting greenhouse gas emissions, addressing climate change and global warming. During the 1980s, voluntary codes of conduct were developed by private groups; especially those are in apparel business. The first apparel company, Levi Strauss & Co, adopted the code of conduct in 1991.

All these initiatives have taken social compliance to get into the place it is now today. A single effort on this sophisticated issue would never resolve the problems the apparel industry was suffering from.

Rasheda K. Chowdhury, Executive Director, Campaign for Popular Education (CAMPE) & former Adviser, Caretaker Government of Bangladesh-2008 along with some other prominent journalists is unwrapping the 10th issue of Babylon Kathokata.

One of the consultant doctors is examining a patient at the Free Health Camp organized by Babylon Medical Services in 2016.

One of the scholars is receiving his 1st installment of scholarship from Mr. Ibrahim Khaled, Director, Kendrio Kochi Kachar Mela. (2016)

Babylon team is distributing warm clothes to the cold affected people of northern Bangladesh in December 2015.

Shri Dharmendra Pradhan, Minister of State- Independent Charge, Republic of India, visited Babylon Garments Ltd. on 18 April 2016.

Members of Babylon Photography Club active on a tour of photography at Sundarbans, the world renowned mangrove forest in Bangladesh.

Babylon authority is giving out stipend to her workers for the education of their children.

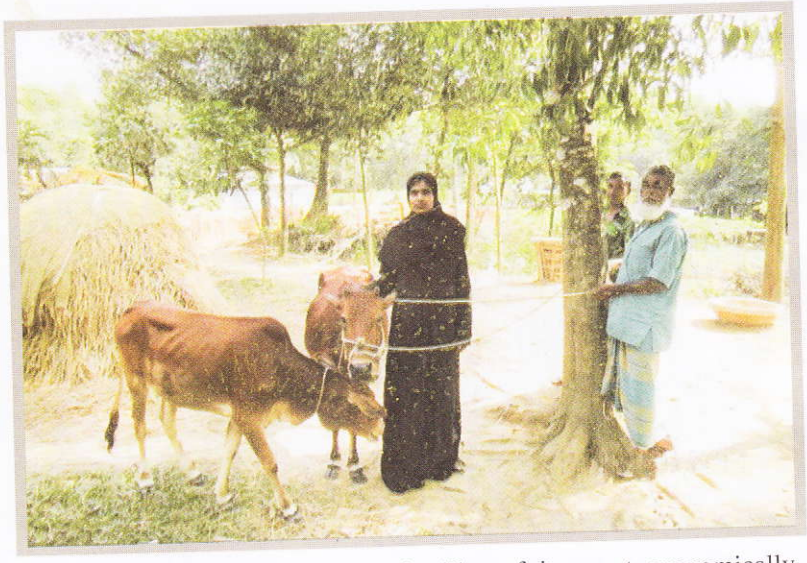

Babylon donates cattle to the families of its most economically challenged employees to uplift their living standard.

# Securing Safe Food for All

## Our Concerns

- Seeds
- Agrochemicals
- Fertilizers

**BABYLON**


**ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিমিটেড**

২-বি/১ দারুস সালাম রোড, মিরপুর ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ

ফোন ঃ ৮০২৩৪৯৫-৬, ৮০২৩৪৬২-৩, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮০৩২৯৪৯

## ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ-

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড
- অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড
- অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড
- অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড
- জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিমিটেড
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিমিটেড
- ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড (ট্রেন্ডজ)
- ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিকস লিমিটেড
- ব্যাবিলন মেরিন ভেনচারস
- ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিমিটেড
- নিউজেন টেকনোলজি লিমিটেড
- ব্যাবিলন রিসোর্সেস লিমিটেড
- গ্রামীণ ব্যাবিলন প্রোডাক্টস

**Head Office:**

2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.

Tel : 9023495-6, 8034266, 9023460, 9023462-3, 9015165 (Off
9010533, 9007175 (Fac)

Fax : 880-2-8032949

E-mail: babylon@babylon-bd.com

Web : www.babylongroup.com